সাহিত্য সমীক্ষা

গোপাল ভৌমিক

130

সাহিত্য সমীক্ষা

গোপাল ভৌমিক

জ্ঞান তীর্থ
৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

প্রথম প্রকাশ, দোল পূর্ণিমা, ১৩৬৯

প্রকাশক :—
অজিতকুমার বসু
জ্ঞানতীর্থ
১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—বারো

প্রচ্ছদ শিল্পী :
অন্নদা মুন্সী

মুদ্রাকর :—
প্রশান্তকুমার মান্না
মহাকালী প্রেস
৩৪-বি, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলিকাতা—নয়

দাম—চার টাকা

মুখবন্ধ

'সাহিত্য সমীক্ষা' আমার সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের প্রথম বই না হলেও আমার সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর প্রথম সংগ্রহ। এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত আমার 'সাহিত্য ও সমাজ' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি অধুনালুপ্ত 'পূর্বাশা' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন প্রায় আঠার বৎসর আগে। অন্য প্রবন্ধগুলি আমার সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে লিখিত এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত।

বংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সমন্ধে আমার যে ধ্যান ধারণা 'সাহিত্য সমীক্ষায়' সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে তাকেই পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করলাম। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এ প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে বলে এখানে ওখানে কিছু মতামতের বিভিন্নতা হয়তো চোখে পড়তে পারে। তবে মূল স্বরের বিভিন্নতা বড় একটা দৃষ্টিগোচর হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। সেই মূল সুর হল সাহিত্যের সমাজধর্মী স্বরূপ। সাহিত্য-শিল্পের বিচারে আমি সমাজতান্ত্রিক মতবাদে আস্থাবান এবং সাহিত্যের বিবর্তন সমাজ বিবর্তনের অনুগামী বলেই আমি মনে করি। সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তাকে মেনে নিয়েও তাঁর উপরে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রভাবকে কোন রূপে অস্বীকার করা চলে না বলেই আমার ধারণা। আমি এই দৃষ্টি-কোণ থেকেই বংলা সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি এ বইয়ের প্রবন্ধগুলিতে। তবে নিজে কবিতা লিখি বলেই বোধ হয় কবিতা সম্বন্ধে আলোচনাটা একটু বেশী মাত্রায় আছে। আশাকরি, সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা এই ভারসাম্যহীনতার ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন।

সাহিতের মূলনীতি সম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধে কিছু কিছু বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণাও হয়তো আছে। তবে সাহিত্য বিচারে এ বিতর্কের অবকাশই শুধু নয়, প্রয়োজনও বোধ হয় অপরিহার্য। খাঁটি সত্যে পৌঁছুতে হলে বিতর্কের পথ বোধ হয় এড়ানো যায় না। গণতন্ত্রে আমার অখণ্ড বিশ্বাস আছে বলে মত ও পথের ভিন্নতা মেনে নিতে আমায় কুণ্ঠা নেই।

যুগে যুগে মানুষেরজীবনের মত সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়নেরও প্রভূত সুযোগ থাকে বলে আমি মনে করি। সাহিত্য সমাজেরই মত ক্রমবিবর্তনশীল বলে কালের কষ্টিপাথরে বারবার সাহিত্য-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার যাচাই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি যতদিন থাকবে ততদিন সে প্রয়োজন ফুরোবে না।

পরিশেষে আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে আমার একাধিক অকৃত্রিম সুহৃদকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করলে আমার কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীরণজিৎ কুমার সেন যদি অহেতুক আগ্রহে এ প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ ও বিন্যাসের কাজে সহায়তা না করতেন, তবে এগ্রন্থ কোনদিনই হয়তো প্রকাশের আলোক দেখত না। অপর সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীরমাপতি বসু যদি 'জ্ঞানতীর্থের' কর্ণধার শ্রীকানাই লাল দাশের সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটিয়ে দিতেন, তাহলেও প্রবন্ধগুলি যেমন এতকাল পড়ে ছিল তেমনই থাকত। সুতরাং এঁদের সকলের কাছে আমি যেমন কৃতজ্ঞ, তেমনই এ গ্রন্থের ভাল মন্দ সব কিছুরই সমান দায়ভাগী এঁরা।

গোপাল ভৌমিক

৫০-এ, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯
পঁচিশে ফাল্গুন, ১৩৬৯

॥ অর্ধশতাব্দীর সাহিত্য ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রথম শতার্ধ পার হয়ে আমরা দ্বিতীয় শতার্ধে এগিয়ে চলেছি। এই মুহূর্তটিতে গত ৫০ বৎসরে মানুষ সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে কতটা এগিয়ে গেছে তার হিসাব নিকাশ করার একটা ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক। মানুষ যখন থেকে সভ্যতার পথে পা বাড়িয়েছে তখন থেকে সাহিত্য-শিল্প তার নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মের মধ্যে একটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, সাহিত্য-শিল্পের মধ্য দিয়ে চিরচঞ্চল মানুষের মন খুঁজে ফিরছে নবজীবনের পথ। তাই কোন জাতির সাহিত্য-শিল্পের বিচার করার অর্থই হল সে জাতির প্রাণসম্পদের পরিচয় লাভ করা—সভ্যতার পথে তার অগ্রগতির হিসাব নেওয়া। বর্তমান প্রবন্ধে গত ৫০ বৎসরে প্রধানত ভারতীয় সাহিত্য-শিল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য হলেও প্রথমে বিশ্বের সকল দেশের সাহিত্য-শিল্পের অগ্রগতির সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিচয় পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। তার কারণ আজকের দিনে কোন দেশ বা জাতির পক্ষেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সম্পর্ক বর্জিত হয়ে একক অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সারা পৃথিবীর মানব-গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের একটা নাড়ীর যোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই নাড়ীর যোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করাও বোধ হয় মহৎ সাহিত্য-শিল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব প্রেম, রোমাঁ রোলাঁর সর্বজয়ী দরদ ও বারট্রাণ্ড রাসেলের মানবপ্রেমের মধ্যে আমরা মহৎ সাহিত্যের এই লক্ষণকেই কি প্রতিফলিত হয়ে উঠতে দেখি না?

ভারতবর্ষে আধুনিক সাহিত্যের গত ৫০ বৎসরের অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করার কাজটি আদৌ সহজসাধ্য নয়। এর একাধিক কারণ বর্তমান। এর জন্যে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-শিল্পের রীতি পরিবর্তন কম দায়ী নয়। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে বসে অধুনাতন ইংল্যাণ্ডের অন্যতম নামী কবি ও সমালোচক স্টীফেন স্পেণ্ডার এমন একটি মন্তব্য করেছেন যেটি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর মন্তব্যটির ভাবার্থ এই যে আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য যদি সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যের অনুসারী হত তবে তার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করা সহজ হত, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিকগণ কোন ঐতিহ্য গত নিয়মের ধার ধারেন না। তাঁর এই মন্তব্যটি বহুলাংশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধেও সমান ভাবে খাটে। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের বহু সাহিত্যিক সম্বন্ধে কি একই মন্তব্য করা চলে না? তাই আধুনিক সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণাগার থেকে মূল সত্যকে খুঁজে বের করা আদৌ সহজসাধ্য নয়—তার কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও চলছে—সাহিত্য-শিল্পীরা নিজেরাই কোন নূতন জীবনদর্শন আজও খুঁজে পেয়েছেন কিনা সন্দেহের বিষয়।

॥ যুগ-লক্ষণ ॥

গত ৫০ বৎসরের সাহিত্যালোচনা আরম্ভ করার পূর্বে এ যুগের প্রধান লক্ষণগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা ভাল। কেননা সাহিত্য-শিল্প মানবজীবন ও সামাজিক প্রভাব থেকে বহুলাংশে উদ্ভূত বলে যুগের সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি গভীর এবং যুগের পট-ভূমিকায় ফেলে তাকে বিচার করতে না পারলে তার অনেক কিছুই দুর্বোধ্য থেকে যায়। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী শতাব্দীর সাহিত্যের অনেক বিভিন্নতা আছে—এ কথাটি নতুন করে বলা বোধ হয় নিরর্থক। তার কারণ মানবজীবন ও মানুষের সৃষ্ট

সাহিত্য-শিল্প সতত পরিবর্তনশীল এবং প্রত্যেক যুগ বা শতাব্দীর সাহিত্যের সঙ্গেই অপর যুগ বা সাহিত্যের বিভিন্নতা থাকে। সে হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ৫০ বৎসরের সাহিত্য-শিল্পের ব্যবধান থাকবে এতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? কিন্তু যখন আমরা এই ব্যবধানের ব্যাপকতা ও গভীরতার কথা ভাবি তখন বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। মাত্র ৫০ বৎসরে মানুষের সাহিত্য-শিল্প যে বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে সারা উনবিংশ শতাব্দীতে তত বড় কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা সন্দেহের বিষয়। এ জন্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ৫০ বৎসরের ঘটনাবহুলতা অনেকাংশে দায়ী। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে যন্ত্রবিপ্লব ঘটেছিল তার ফলে মানুষের সাহিত্য-শিল্পের মোড় একবার ঘুরেছিল। তারপর সারা শতাব্দী ধরে তার অগ্রগতি ছিল অব্যাহত। কিন্তু সে অগ্রগতি প্রথম ধাক্কা খায় এসে বিংশ শতাব্দীতে। মানুষ দেখতে পায় যে যন্ত্র-বিপ্লবের পরিণতি শুধু পূর্ণতালাভই করেনি—কোন কোন ক্ষেত্রে তার কুফল ফলতেও সুরু হয়ে গেছে। অপরদিকে রেডিও, টেলি-ফোন, টেলিভিশন, সিনেমা প্রভৃতির দ্রুত প্রসারের ফলে দূরের পৃথিবী এসে পড়েছে নিকটে। আন্তর্জাতিক ভাব আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেছে যে পৃথিবীর দূরতম কোন প্রান্তে যদি কোন নতুন আন্দোলন আজ দেখা দেয়, তবে মাত্র ২।৪ দিনের ব্যবধানে সে সম্বন্ধে পুরো খবর পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব। আজকের পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যে বুদ্ধি-বাদের যে লীলাখেলা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মূলে আছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাব আদান-প্রদানের এই সহজসাধ্যতা। আধুনিক সাহিত্যকে জটিল করে তোলার পক্ষে আর যে জিনিসটি সাহায্য করেছে সেটি হল জ্ঞান-বিজ্ঞান—বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন তত্ব আবিষ্কার ও আধুনিক সাহিত্যের দরবারে

তাদের হানা। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, কার্ল মার্ক্সের জড়বাদী জীবনদর্শন, বার্গসঁর প্রাণশক্তির রহস্যোদ্ঘাটন, হ্যাভ্‌লক্ এলিস্, লয়েড্, য়ুং প্রমুখ মনীষীদের মনোবিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যাবিষ্কার আধুনিক সাহিত্যকে কতভাবে প্রভাবিত করেছে সে কথা বলে বোঝানোর বোধ হয় কোন প্রয়োজন নেই। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের একটা মূলগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে—প্রথমোক্তের আবেদন ছিল মানুষের হৃদয়ের কাছে আর শেষোক্তের আবেদন হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলত বুদ্ধিবাদের কাছে, মস্তিষ্কের কাছে। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বিষয়বস্তু ছিল মুখ্য—বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকের কাছে বিষয়বস্তু গৌণ, স্টাইল, বা রচনাশৈলীই প্রধান।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে জটিলতা সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ মাত্র ২০ বৎসরের ব্যবধানে পৃথিবীর বুকে দুটো মহাযুদ্ধের সঙ্ঘটন। এই দুটো মহাযুদ্ধ সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামোকে কিভাবে ভেঙ্গে চুরমার করেছে তার ফল আমরা প্রতিনিয়ত মর্মে মর্মে ভোগ করছি। এই দুটি মহাযুদ্ধের ফলে বুদ্ধিজীবী মানুষের পুরাতন বিশ্বাসের বুনিয়াদ গেছে শিথিল হয়ে—অথচ নতুন বিশ্বাসও সে খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে সংশয় সন্দেহ ও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মর্মবাণী। আজকের দিনের সাহিত্য তাই কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয় না। তার যাত্রাপথ তাই এত তির্যক, এত সঙ্কট-সঙ্কুল। কেউ কেউ হয়তো উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অনুষ্ঠিত নেপোলিয়ঁর সংগ্রামের নজির দেখিয়ে বলতে পারেন যে "কই সে যুদ্ধের ফলে তো মানুষের জীবনে এরূপ দুর্দৈব নেমে আসে নি—মানুষ এতটা সন্দেহ বা সংশয়বাদী হয়ে ওঠে নি"। কিন্তু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, নেপোলিয়ঁর যুদ্ধের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত দুটি মহাযুদ্ধের কোনটিরই তুলনা চলে না। নেপোলিয়ঁর যুদ্ধে জাঁক-জমক বা বীরত্বের চমক হয়তো বেশী ছিল

কিন্তু সে যুদ্ধের প্রভাব ১৯১৪—১৮-এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা ১৯৩৯—৪৫-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবের মত মারাত্মক হয় নি। তার ব্যাপকতা বহুলাংশে সীমাবদ্ধ ছিল ইউরোপের মধ্যে—এমন করে সারা পৃথিবীর ভিত্তিমূল সে কাঁপিয়ে তুলতে পারেনি। একই জীবনে দু দুটি বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েও সাহিত্যিক তাঁর পুরাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে বসে থাকবেন—বুদ্ধির আলোকে তাকে যাচাই করে নিতে চাইবেন না—একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্য-শিল্পের ভাবধারায় এত পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। প্রতি দশ বৎসর পরপর সাহিত্য-শিল্পীরা পুরাতন পথ বর্জন করে নতুন পথের সন্ধান করেছেন এরূপ নজিরও দুর্লভ নয়। এতে বিস্ময়ের কিছু আছে বলে মনে করি না। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের সম্যক্ উপায় খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সাহিত্য-শিল্প নিয়ে এই পরিবর্তনের খেলাই হয়তো খেলে যাবেন। এই পরিবর্তন প্রয়াসের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে সার্থক সৃষ্টি না হয়েছে এমন নয়। তবে ব্যর্থতার পরিমাণে সার্থকতা অনেকটা কম। তবু মানুষের শিল্প-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হবার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। যে সদাজাগ্রত শুভবুদ্ধি মানুষের শিল্পসৃষ্টির সহায়ক পৃথিবীতে তার কোন প্রত্যয় ঘটে নি এবং তা যদি না ঘটে থাকে তবে মানুষের সাহিত্য-শিল্পের ক্রমবিবর্তনে বড় কোন ছেদও পড়বে না।

॥ এশিয়ায় ভাববিপ্লব ॥

উপরে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের যে পটভূমিকা দিলাম, আধুনিক ভারতের সাহিত্য-শিল্পের মাননির্ণয়ে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তার কারণও পূর্বেই বলেছি। আজকের দিনে পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যই বিশ্বের সাধারণ ভাবধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে

বাঁচতে পারে না। বিশ্বভাবধারার অনুসরণে গত ৫০ বৎসরে ভারতের সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি এবং সে পরিবর্তনের কথা যথাসময়ে আলোচিত হবে। বর্তমানে এশিয়ার পটভূমিকায় ভারতের অবস্থিতি ও ভারতের নবজাগরণের কথা কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে সাহিত্য-শিল্পের ঐতিহ্য কত প্রাচীন—সে কথা আমাদের কারও অজানা নয়। ভারতবর্ষ ছাড়াও এশিয়াতে এমন আরও অনেক দেশ আছে যাদের শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী প্রাচীন। অথচ বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রতিটি দেশে যখন তীব্র ভাববিপ্লব দেখা দিয়েছে, সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে এসেছে নতুন কর্মপ্রেরণা, তখন প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেশী দূর যেতে হয় না। এর জন্যে দায়ী হল পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ ও প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশের মূঢ় সংস্কারান্ধতা। পরিবর্তনকে আমরা বড় ভয় করি। সংস্কারের অন্ধ অনুগমন করতে গিয়ে যে জড়ত্ব আসে তাকেও মেনে নিতে আমরা রাজী, তবু কুসংস্কার বর্জন করে নতুন ভাবকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিজেদের সুপ্ত শক্তির দ্বার খুলে দিতে আমরা রাজী নই। সাম্রাজ্যবাদী শাসক যারা-তারা চায় শাসিত দেশে সংস্কারান্ধতাকে কায়েম করে রাখতে। এতে তাদের শাসন ও শোষনের সমান সুবিধা। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলে গত দেড়শ বছরে কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের সাহিত-শিল্প বেড়ে উঠেছে তার ইতিহাস আলোচনা করলেই এ উক্তির তাৎপর্য বোঝা যেতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে মাত্র কয়েক বৎসর। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ৪৭ বৎসরই ভারতবর্ষের কেটেছে পরবশতার অন্ধকারে। কিন্তু তার মধ্যে থেকেও ভারত তার শিল্পসাহিত্যে সমৃদ্ধির যে পরিচয় দিয়েছে এশিয়ার আর কোন দেশে তার তুলনা মেলে না। বিংশ শতাব্দীর এশিয়ায় পরাধীন ভারতকে

যদি ভাববিপ্লবের মূর্তপ্রতীক বলে অভিহিত করি তাহলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতবর্ষ ছাড়াও এশিয়ায় অন্তত আর দুটি দেশ ছিল, যাদের শিল্পসাহিত্যের ঐতিহ্য কোন অংশে কম নয়। সে দুটি দেশের আর একটি বড় সুবিধা এই ছিল যে তারা স্বাধীন তবু তারা গত ৫০ বৎসরে শিল্প-সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে ভারতের অনুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। বলা বাহুল্য আমি চীন ও জাপানের কথা বলছি। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত মহাচীনের উপরও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রখর দৃষ্টি বড় কম ছিল না। চীনকে কাবু করবার জন্যে, বিশেষ করে চীনের কাছ থেকে ব্যবসায়গত সুবিধাজনক সর্তাদি আদয়ের জন্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে একাধিকবার চীনের বুকে হামলা করেছিল তার খবর ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন। অপরদিকে বৃটিশ ও মার্কিণ মিশনারীগণ চেষ্টা করেছিলেন চীনকে সংস্কৃতির দিক থেকে জয় করতে। এর কোনটিই অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। অপর পক্ষে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীনে চীনের জাতীয় জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য বেড়ে চলেছিল প্রতিনিয়ত—কোটি কোটি নরনারী অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে শোচনীয় জীবন-যাপন করছিল—এমন কি পরস্পর-বিরোধী স্বার্থান্বেষীদের সংগ্রামের ফলে চীনের জাতীয় জীবনে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনও সম্ভব হয় নি। ছোটখাটো ধরণের বিদ্রোহ, বিপ্লব, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্দৈব ছিল চীনের জাতীয়-জীবনের নিত্যসঙ্গী। এই অবস্থার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর কেটে যায়। তারপর ডাঃ সুন্-ইয়াৎসেনের নেতৃত্বে চীনে প্রজাবিপ্লব ঘটে ও প্রথম সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। প্রত্যাশা করা গিয়েছিল যে অতঃপর চীনের জাতীয়-জীবনের অন্ধকার কেটে গিয়ে তার সাহিত্য-শিল্প দর্শনবিজ্ঞানে আসবে নতুন সৃষ্টির জোয়ার। কিন্তু কার্যত প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের

জন্যে এ আশা সফল হয়ে ওঠার কোন অবকাশই পায় নি। চীনের জাতীয় সাহিত্যে নব বিপ্লব সৃষ্টির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল তার ভাষার জটিলতা। একথা অবিশ্বাস্য মনে হলেও চীনের ভাষা ও ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরাই খোঁজ রাখেন তাঁরাই জানেন যে চীনা ভাষার অক্ষর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। তা ছাড়া, এ ভাষার কথ্যরূপের বিভিন্নতা ছিল অনেক। এই ভাষাকে বিপ্লবোত্তর যুগে প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করার চেষ্টা করেন বিংশ শতাব্দীর চীনের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও ভাষা-সংস্কারক হুসি। তিনি চীনের জাতীয় ভাষার অক্ষর সংখ্যা কমিয়ে ১৩০০ করেন। কিন্তু তাঁর এই সংস্কারের পুরোপুরি ফল ভোগের সুযোগ চীনবাসীদের হয় নি। তার কারণ বিপ্লবোত্তর চীনের শান্তি ও স্থৈর্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। গত ২০ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল চীনের কুওমিনটাঙ দলের অধিনায়ক চিয়াং কাইশেক ও কম্যুনিষ্ট দলের অধিনায়ক মাও-সে-তুঙের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী গৃহবিপ্লব লেগে ছিল তার কাহিনী আমাদের সকলেরই কাছে সুবিদিত। মাত্র বৎসর কয়েক হল কম্যুনিষ্টদের বিজয়ের ফলে সে রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রামের অবসান ঘটেছে। মহাচীনের জাতীয়জীবনে এই নতুন রাষ্ট্রসংস্থার ফল কি রূপ নিয়ে দেখা দেবে তার বিচারের দিন আজও আসে নি। ইত্যবসরে এই গৃহ-বিপ্লবের মধ্যেও চীনের শিল্প-সাহিত্যের অগ্রগতি অবশ্য বন্ধ ছিল না। কুওমিনটাঙ চীন ও কম্যুনিষ্ট চীন উভয়ত্রই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চীনের ভৌগোলিক সীমার উর্দ্ধে উঠে এশিয়ায় বা বিশ্বের দরবারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি বলে এখানে তার আলোচনা করা নিরর্থক। মোট কথা এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এশিয়ার ভাববিপ্লব বা নবজাগরণে বিংশ শতাব্দীর চীন নানা কারণে নেতৃত্ব করতে পারে নি। বিংশ শতাব্দীর চীনের যে লেখকটি স্বদেশের বাইরে মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন তিনি হলেন লিন-ইয়ু-টাঙ। তবে তিনি

আমেরিকা প্রবাসী ও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বাহন মাতৃভাষা নয়—ইংরাজী ভাষা।

বিংশ শতাব্দীর জাপানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জাপান আবার অন্য কারণে এশিয়ার ভাবজগতের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে কারণটি হল তার অনুকরণপ্রিয়তা। এই অনুকরণপ্রিয়তার ফলে বিংশ শতাব্দীর জাপান তার নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্ত্যের জাতিপুঞ্জ—বিশেষ করে আমেরিকার জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি ও ধনসম্পদের প্রাচুর্য সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে এভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান সর্ব বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুগামী হয়ে ওঠার দিকে মনোনিবেশ করেছিল। জাপানের আচার-ব্যবহার পোষাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন তো ঘটেছিলই, তার প্রাণসম্পদেও পড়েছিল ঘাটতি। অনুগমনের পথে ধনসম্পদ ও শক্তিসামর্থ্যে জাপান মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে পাশ্চাত্ত্যের যে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে তার একাধিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি। জাপানের শৌর্যবীর্যের চমকপ্রদ পরিচয় পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ এশিয়ার অনেক দেশের মনে যে নতুন আশার আলোক এনে দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় শৌর্যবীর্যের অনুপাতে আধ্যাত্মিকতার অভিমুখে জাপানের অগ্রগতি হয়েছিল অনেক কম। ফলে জাপানের শিল্প-সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীতে কোন নতুন ভাবধারার বিকাশ বড় একটা দেখা যায় নি কিংবা জাপানের জাতীয়-সাহিত্যে সেরূপ প্রতিভাবান কোন কবি বা ঔপন্যাসিকের সন্ধানও আমরা পাই না। তাই জাপানের বাইরে তার শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার সুষ্ঠু সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জাপান তাকে সৃষ্টিমুখর করে তোলার চেষ্টা করে নি বলেই তার

এ দুর্দশা ঘটেছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও রচনাশিল্পের অন্ধ অনুকরণের ফলে বিংশ শতাব্দীর জাপানী সাহিত্য নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উর্ধে উঠে বড় কিছু সৃষ্টি করতে পারে নি। এই বন্ধ্যাত্বের জন্যে জাপানে ক্রমবর্ধমান সামরিকবাদ ও ফ্যাসিষ্ট রাজনীতিও কম দায়ী নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপানের রাষ্ট্রজীবনে এই দুর্লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে উঠতে থাকে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে জাপানের কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকরাও তাঁদের শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলতে থাকেন। এরকম শ্বাসরোধ-করা আবহাওয়ার মধ্যে বড় ধরণের কোন সাহিত্য-সৃষ্টি যে সম্ভব নয়, হিটলারের আমলের জার্মানী ও মুসোলিনীর আমলের ইটালী থেকেও আমরা তার সন্ধান পাই। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পত্রযোগে যে বাদানুবাদ হয়েছিল আমরা পাঠক-পাঠিকাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

চীন ও জাপান বাদ গেলে বাকী রইল ভারত। ভারতবর্ষের গত ৫০ বৎসরের সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে বিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার মর্মবাণীকে সাহিত্যশিল্পের মাধ্যমে নতুন করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার কাজ যদি কোন দেশ করে থাকে, তবে সে ভারত। আর ভারতের সেই ভাবরাজ্যের অধিনায়করূপে দাঁড়িয়ে আছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীজী আর রবীন্দ্রনাথ—বিংশ শতাব্দীর এশিয়ায় ভাববিপ্লবের এঁরাই হলেন মূর্ত প্রতীক।

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

রবীন্দ্রনাথকে বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের মহাবিস্ময় বললে অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বের যে কোন স্বাধীন ও সুপ্রাচীন সংস্কৃতি-

সম্পন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি এ যুগের একটি মহাবিস্ময় বলেই পরিগণিত হতেন। ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর ঔপনিবেশিক দেশে তাঁর মত মহামনীষীর জন্ম যে কত বিস্ময়কর সে কথা বোধ হয় বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পটভূমিকা সামনে রেখেই বিচার করি, উদার ও প্রাচীন যে ঠাকুর পরিবারে আভিজাত্যের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার কথাই আলোচনা করি কিংবা বাংলা সাহিত্যে তাঁর অগ্রগামী মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিপ্লবপ্রয়াসের আলোকেই তাঁর জীবন-দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করি, তবু রবীন্দ্রপ্রতিভার বিরাটত্ব, ব্যাপকত্ব ও বৈচিত্রের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর সম্বন্ধে যত কথাই বলি না কেন তাঁর প্রতিভা-রহস্যের অনেকখানিই যেন অকথিত থেকে যায়। আমরা তাঁর এত বেশী সান্নিধ্যে বাস করেছি, তাঁর ধ্যানধারণা, চিন্তা ও মনন এমনভাবে আমাদের মনকে আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র দুই দশকের মধ্যে আমাদের পক্ষে তাঁর প্রতিভার সম্যক্ পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আমাদের জাতীয়-জীবনে, সমাজ-জীবনে ও শিল্প-সাহিত্যে আজও তিনি জীবন্ত সত্য—জ্বলন্ত তাঁর স্বাক্ষর। সুতরাং নৈর্বক্তিক বৈজ্ঞানিক সুলভ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর প্রতিভার বিচার করার সম্ভাবনা কোথায়?

আমাদের সাহিত্য-শিল্পে বিংশ শতকের পাঁচটি দশকের মধ্যে চারটি দশকেই আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র আধিপত্য। তাঁর নিত্যনব সৃষ্টিশীল প্রতিভা শুধু বাংলা দেশ নয়, বহু ভাষাভাষী ভারতের প্রায় সকল ভাষার সাহিত্যের উপরই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্থান ও কালজয়ী তাঁর প্রতিভার মর্মবাণী ভারতের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল বিশ্বের দরবারে। সারা বিশ্ব তাই গভীর আগ্রহে এই মহামনীষীর লেখনীমুখ থেকে শুনেছে নবজাগ্রত এশিয়ার মর্মবাণী। একমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের

মধ্য দিয়ে যদি আমরা গত ৪০ বৎসরের মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা খুঁজে পেতে চাই, তা হলেও বোধ হয় আমরা ব্যর্থ-কাম হব না। যে বিরাট অনুভূতির তিনি অধীশ্বর ছিলেন তার কাছে ধরা পড়ে নি—মানবমনের এমন কোন রহস্যের সন্ধান বড় একটা আমরা জানি না। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস অনেকটা গোটা ভারতবর্ষের অর্ধ শতাব্দীর সাহিত্য-শিল্পে অগ্রগতির ইতিহাস। এর থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে আমাদের সাহিত্য-শিল্পে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অপর কোন প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেয় নি। বরং তিনি জাতীয় চেতনার নূতন দ্বার যেভাবে খুলে দিয়েছেন, তাতে তাঁর অনুগামী সাহিত্যিকদের পক্ষে সৃষ্টিকার্যে অনেকখানি সহায়তাই হয়েছে। রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমার এ উক্তির যথার্থ্য ধরা পড়বে। রবীন্দ্র-প্রভাববর্জিত না হয়েও এ যুগের সাহিত্যকে যাঁরা নানাভাবে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকারের অভাব নেই। কবিতার ক্ষেত্রে যাঁদের নাম করতে পারি, তাঁদের মধ্যে আছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, করুণানিধান বন্দ্যো-পাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, মোজাম্মেল হক, সুকুমার রায় প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম না করলে কর্তব্যচ্যুতি ঘটে। নাট্যকাররূপে তাঁর খ্যাতি অধিকতর হলেও তাঁর স্বদেশী কবিতা ও হাসির কবিতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন তিনি কত উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। কান্তকবি রজনীকান্ত সেন ও অতুল প্রসাদ সেনের গানের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যুগের কবি। কিন্তু বাঙলার কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এঁদের দান কি অবহেলার যোগ্য?

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্ব-প্রথম যাঁর নাম মনে পড়ে, তিনি হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান নিয়ে এখানে আলোচনার অবকাশ নেই। তবু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, তিনি যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয়ের কোন প্রশ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথের মত একটি মহামহীরুহের পাশে এসে না পড়লে তিনি নিজেই যুগপতি হতে পারতেন। বাংলার অবজ্ঞাত পল্লীজীবনের দরদী ঔপন্যাসিকরূপে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে বিচার করলে তিনি অনেকক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে যান। অন্যান্য যাঁরা গল্প-উপন্যাস লিখে এ যুগে নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলবালা ঘোষজায়া, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার প্রভৃতি। গদ্য-সাহিত্যের প্রবন্ধেরদিকেও এযুগে বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার সন্ধান আমরা পাই। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয়ের অপূর্ব গদ্যসৃষ্টি এই যুগেরই অন্তর্গত। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' বাংলা সাহিত্যের রচনাশৈলীতে যে অভিনবত্ব আমদানী ও নবপ্রাণ সঞ্চারে সহায়তা করেছিল, তার কথা সহজে ভোলবার নয়। এ ছাড়াও এ যুগেরবিশিষ্ট গদ্য-লেখকদের মধ্যে আছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন, বিনয়কুমার সরকার, অজিতকুমার চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রভৃতি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বাংলা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যুগ কত বেশী সৃষ্টিমুখর ছিল।

সাহিত্যের সম্মুখে তিনি অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিলেন বলেই এই অদ্ভুত সক্রিয়তা ও সৃষ্টিমুখরতা সম্ভব হয়েছিল—একথা বোধ হয় যে—না বললেও চলে।

ভারতের ভাবজীবনে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনাদর্শের প্রতীক তার মূল খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার অপূর্ব মিলন। প্রাচ্যের যে সুপ্রাচীন জীবনাদর্শ ও ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের পরবশতার ফলে নিষ্ক্রিয় ও জড় সংস্কারপন্থী হয়ে উঠেছিল, তাকেই তিনি নতুনভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জড়বাদী জীবনদর্শনের প্রলেপ দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী এই দুটি বস্তুর মিলন বা সমন্বয় সাধনের অগ্রদূত তিনি ছিলেন না। এ কাজ শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে—রাজা রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়ে। রামমোহনই ছিলেন আধুনিক ভারতের ভাববিপ্লবের প্রথম পুরোহিত। রামমোহন-পরবর্তী ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু মহাপুরুষ ও সাহিত্যসেবীর মধ্যে এই সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যেই মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে তিনি এই সমন্বয় সাধন প্রয়াসের অগ্রদূত না হলেও এর শ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ ছিলেন। উদ্ধত ও রোষমুখরিত তীব্র জাতীয়তাবাদের মধ্যে জীবনের সবটুকু কাটিয়েও তিনি তাই ছিলেন হিমালয়ের মত ধ্যানগম্ভীর, আকাশের মত উদার এবং বিচিত্র লীলামুখর জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ছিল সুগভীর বিশ্বাস। সর্বদা এবং সকল বিষয়ে ভারতের কল্যাণকামী হয়েও তাই তিনি তাঁর কবিদৃষ্টিকে বিশ্বমুখী করে রাখতে পেরেছিলেন। আর কি বিচিত্র ছিল তাঁর সৃজনী-প্রতিভা! সেকথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। তিনি একা আমাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির কত অভাব ও দৈন্য যে দূর করেছিলেন, সেকথা বিশদভাবে বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। আমাদের সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই, যা তাঁর লেখনী-স্পর্শে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে

নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে আজ ভারতের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিতে পেরেছে, তার মূলে কি রবীন্দ্রনাথের একক প্রয়াসই বর্তমান নয়? সাহিত্য ছাড়াও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কি কম? গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের অঙ্কন-শিল্পে যে নব-সৃষ্টির জোয়ার এসেছে, তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর প্রতিভা যেমন আছে, তেমনই রবীন্দ্রনাথের শিল্পী প্রতিভার স্বাক্ষরও সেখানে স্থায়ী হয়ে আছে। আমাদের সঙ্গীত-শিল্পে যে নতুন ধারা প্রবাহিত, তারও মূল স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। আমরা ইদানীং বৃটিশ আমলের কৃত্রিম শিক্ষাপদ্ধতি বর্জন করে যে স্বদেশী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়াসী হয়ে উঠেছি, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে কি কবিগুরুর শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী দাঁড়িয়ে নেই? একটি ছোট প্রবন্ধের সামান্য একটি অধ্যায়ে ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের সীমাহীন দানের কথা আলোচনা করা যায় না। পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি-প্রতিভার অধিকারী দ্বিতীয় মনীষীর সন্ধান আমরা পাইনা।

॥ ভারতীয় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বৎসর জাতি হিসাবে যেমন ভারতবাসীদের পুনরুজ্জীবন লাভের যুগ, তেমনই সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে এই সময়ের মধ্যে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জবীনই কি শেষ পর্যন্ত প্রতিফলিত হয় না? ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই বা স্বীকৃত সত্যের ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? তাই সামগ্রিকভাবে ভারতের সাহিত্যিক প্রগতি বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, আত্মচৈতন্য ও আত্মোন্নতির পথে জাতি যেমনভাবে এগিয়ে গেছে, তেমনইভাবে আমাদের সাহিত্য-শিল্পেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। পরাধীন দেশের

সাহিত্য-শিল্প কখনও নিছক সৌন্দর্যের পূজারী হতে পারে না ঃ জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে সে সাহিত্যের মধ্যে কিছুটা প্রবণতা থাকবেই। আমাদের সাহিত্যও সে প্রবণতার হাত থেকে মুক্ত নয়। একথা ভুললে চলবে না যে, গত ৫০ বৎসরে আমরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছি, সে হল একটি সংগ্রামী জাতির সাহিত্য। দেশের সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে সেই সংগ্রামের স্মারক চিহ্ন না থেকে কি পারে? রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যেও স্তরে স্তরে এই জাতিগত প্রেরণার দিক আমরা খুঁজে পাই। পরাধীন জাতির সাহিত্যে দেখা যায় যে, এক সময় সে সাহিত্য সাধারণভাবে জাতীয় ভাবধারার অনুগামী—আবার অন্য এক সময় সে সাহিত্য নতুন ভাবধারা সৃষ্টি করে জাতির মনে সংগ্রামের প্রেরণা জোগাচ্ছে। আমাদের গত ৫০ বৎসরের সাহিত্যে এ দুটি লক্ষণই দেখা যায়।)

ভারতের সাহিত্যিক অগ্রগতি বিশদভাবে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং এত সংক্ষেপে সেরূপ আলোচনা সম্ভবও নয়। তার প্রধান কারণ ভারত বহু ভাষাভাষী দেশ এবং তার প্রতিটি বড় ভাষায় এক একটি করে বিরাট সাহিত্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ, অক্লেশে হিন্দি, উর্দু, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, গুজরাটি, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি সাহিত্যের কথা বলা চলে। গত ৫০ বৎসরে এর প্রতিটি সাহিত্যে একাধিক প্রতিভাবান সাহিত্যিক জন্মেছেন এবং তাঁরা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যুগে বাস করে তাঁরা কেউই রবীন্দ্র প্রভাব-বর্জিত ছিলেন না। তাঁদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জানিয়েও একথা বলা চলে যে গত ৫০ বৎসরে ভারতে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ জন্মান নি। শরৎচন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত করে প্রেমচাঁদকে হয়তো এগিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্যার মহম্মদ ইকবালকে তুলে ধরা যায় না। এতে উভয়ের প্রতিই সমান অসম্মান দেখানো হয়।

ভারতবর্ষের সাহিত্যে আমাদের জাতীয় নেতাদের দানও বড় কম নয়। গুজরাটি সাহিত্যে মহাত্মা গান্ধীর দান যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে, এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নেই। ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু মাতৃভাষা হিন্দিতে কিছু না লিখলেও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে তিনি যে সব পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, তাদের সাহিত্যিক মূল্যও বড় কম নয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যে বড় একটি কবিপুরুষ লুকিয়েছিলেন, তার স্বাক্ষর একাধিক গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যেও সাহিত্যিক প্রেরণা খুব কম ছিল না। ভারতের ভূতপূর্ব খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী বর্তমান গুজরাটি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক বলে বিবেচিত হন। খুঁজতে গেলে এরূপ আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। মোট কথা, এবিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে গত পঞ্চাশ বৎসরের ভারতীয় সাহিত্য কোন মরা জাতি বা মৃতপ্রায় জাতির সাহিত্য নয়। সে সাহিত্য নব-জীবনের আহ্বানে সৃষ্টিমুখর আর সে আহ্বান-ধ্বনি উদাত্ত সুরে প্রথম যাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ।

॥ সাম্প্রতিক অবস্থা ॥

সাম্প্রতিক অবস্থা বলতে আমি বুঝি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যের অবস্থা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন। তবু এই যুগবিভাগ কেন—এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠতে পারে। তার উত্তরে আমি বলব যে এ সময় রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলেও নতুন যুগের সাহিত্যিকগণ এই সময় কতকগুলি কারণে রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের এই নতুন প্রয়াসের মূলে ধারণা ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিরীতি অনুসরণ করে জাতির সাহিত্য-

ভাণ্ডারে মৌলিক কিছু দান করা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা বিদ্রোহে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁদের তথাকথিত বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মূলে সারবস্তু ছিল না বলে এ বিদ্রোহ সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যে জীবনাদর্শের প্রতীক ছিলেন সে জীবনদর্শনকে অস্বীকার করেও এঁরা তার পরিবর্তে নতুন কোন জীবনদর্শন এগিয়ে দিতে পারেননি। তাঁদের বিদ্রোহ তাই পর্যবসিত হয়েছিল নিছক দেহাত্মবাদে ও আঙ্গিকের অনাবশ্যক উৎকর্ষ সাধনে। বলা বাহুল্য, কোন ভঙ্গীসর্বস্ব সাহিত্য দীর্ঘদিন টিঁকে থাকতে পারে না। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তৎকালীন বিদ্রোহী কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী অনেকেই বর্তমানে যথেষ্ট খ্যাতির আসনে উপবিষ্ট। পরবর্তী জীবনে তাঁরা অনেকেই নতুন করে রবীন্দ্রভক্ত হয়ে উঠেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমাদের সাহিত্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার মূলে একাধিক সামাজিক ও সাহিত্যিক কারণ যেমন আছে তেমনি বিদেশ থেকে বয়ে আসা বুদ্ধিবাদের হাওয়াও আছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে আমাদের সাহিত্যেও আজ হৃদয়াবেগ বা হৃদয়ানুভুতির চেয়ে বুদ্ধিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক বড়। এই হল একদিকের অবস্থা, অপরদিকে আছে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের অর্থাভাবজনিত বিক্ষোভ। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বরাবর যে আশাবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে নৈরাশ্যবাদ পরিবৃত রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের সাহিত্যিক শিল্পীরা আর সান্ত্বনা পাননি। ফলে তাঁরা নতুন পথের সন্ধান করেছেন। সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন সৃষ্টিপথের সন্ধান করা প্রগতির পক্ষে সহায়ক। কিন্তু আমাদের দেশের নব-সাহিত্য আন্দোলন কার্যত সে পথের সন্ধান করা অপেক্ষা বুদ্ধিবাদী বিংশ শতাব্দীর নানাবিধ 'ইজমে'র দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল বেশী করে। ফলে সে সাহিত্য বহু ক্ষেত্রেই হয়েছে কৃত্রিম—জাতির বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র বড় শিথিল।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের দুর্লক্ষণগুলি যেমন বর্ণনা করলাম, তেমনই তার সুলক্ষণও আছে। তা যদি না থাকত তবে আমাদের শিল্প সাহিত্যের ধারা কবেই শুকিয়ে যেত। কিন্তু সুখের বিষয় আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির স্রোতে ভাঁটা পড়েনি। চটকদার বুলি কপচিয়ে সস্তা হাততালি লাভের লোভ সম্বরণ করে অনেক সাহিত্যিকই আবার ঐতিহ্যানুসারী সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন এবং এ যুগে একাধিক মহৎ সৃষ্টির সাক্ষাৎও আমরা পেয়েছি। তাই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত হয়ে ওঠার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক আজ হয়ত অন্ধকারে আত্মপ্রকাশের পথ হাতড়ে ফিরছেন। যেদিন সে পথের সন্ধান তিনি পাবেন সেদিন তাঁর লেখনী মুখে অজস্র ফুলঝুরিই শুধু আমরা দেখতে পাব না, তাঁর কবিতায়, তাঁর গল্পে, তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়বে আমাদের সতত পরিবর্তনশীল জীবননাট্যের মূল সুরটি। মাঝখানে যে বুদ্ধিবিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল তার ঘোর ইতিমধ্যেই অনেকটা কেটে গেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি নগণ্য নয়। অনুকূল পারিপার্শ্বিক বর্তমান থাকলে আগামী পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের শিল্প-সাহিত্যের আরও অগ্রগতি হবে—এ বিশ্বাস আমার আছে।)

॥ সমাজ ও সাহিত্য ॥

"Art, life and politics are indivisible and inseparable."-Alexander Blok.

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সাহিত্যের বিচার খুব বেশীদিন হ'ল শুরু হয় নি'। বিদেশী সাহিত্যে বেশ কিছুদিন হ'ল এই বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় নতুন ক'রে সাহিত্যের বিচার শুরু হয়েছে; তবু সেখানেও আজ পর্যন্ত অতিপ্রচলিত গোঁড়া অবৈজ্ঞানিক রুচি-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই বিজ্ঞান-সম্মত নতুন রুচি-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে পারে নি। অন্যান্য সর্ববিষয়ের মত সাহিত্য বিষয়েও বাংলা দেশ বৈদেশিক গোঁড়ামিকে হার মানায়; তাই এই নতুন সাহিত্য-সমালোচনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বহু রুচি-বাগীশ সাহিত্য-সমালোচক বিষোদ্গার ক'রেছেন, কিন্তু যুক্তি দিয়ে নিজেদের মতবাদকে সমর্থন করতে তাঁরা পারেন না। তার কারণ এই যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সাহিত্য-বিচার পুরোদস্তুর বিজ্ঞান-সম্মত এবং সাহিত্যের নানারূপ জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র এই মতবাদের দ্বারাই সম্ভব।

ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতির মত সাহিত্যেরও কোন সমাজনিরপেক্ষ ভিন্ন সত্তা নেই। সাহিত্যের সমাজ-নিরপেক্ষ একটা শাশ্বত সত্তাকে মেনে নেন ব'লে গোঁড়া সাহিত্য-সমালোচকেরা বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। তাঁদের সাহিত্য-দর্শনে তাই বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদের সংমিশ্রণ দেখা যায়। নেহাৎ পার্থিব ঘটনার কারণ খুঁজতে তাঁরা তাই অপার্থিব ভাবের রাজ্যে বিচরণ করেন। এইরূপ বিভিন্ন দর্শনের সংমিশ্রণে সমালোচকের পাণ্ডিত্য হয়ত প্রকাশ পায় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়

না। কিন্তু যে সব সাহিত্য সমালোচক সমাজ এবং সাহিত্যের মধ্যে গূঢ় অন্তর্জ্জাতিত্ব ও নির্ভরতা আবিষ্কার ক'রেছেন, তাঁদের সাহিত্যদর্শনে আর কিছু না থাক, আছে মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁদের প্রচারিত সাহিত্য-দর্শনের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। যুক্তির অভাবকে অপার্থিব ভাবের আমদানী দিয়ে ঢাকবার ব্যর্থ প্রয়াস তাঁরা পান নি'।

সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে সাহিত্যসৃষ্টি হ'য়েছে আগে, সমালোচনার সৃষ্টি হ'য়েছে পরে। অ্যারিষ্টোটলই হ'ন বা সংস্কৃত সাহিত্যের আনন্দবর্ধন এবং অভিনব গুপ্তই হ'ন, সব সাহিত্য-তত্ত্বজ্ঞের সম্বন্ধেই একথা খাটে। এঁরা সবাই প্রচলিত সাহিত্যের রূপবিশ্লেষণ ক'রে এমন কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়ম ক'রে গেছেন যেন এর বাইরে গেলে আর সৎসাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব নয়। সাহিত্য-বিষয়ে তাঁদের অনেক সারগর্ভ মূল্যবান মতামত থাকা সত্ত্বেও, আজকের দিনের রুচি-বিজ্ঞান আর তাঁদের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় না। আজকের দিনের সাহিত্য-সমালোচকেরা জানেন যে অন্যান্য সব কিছুর মত রুচিবিজ্ঞানও ক্রমবিবর্তনশীল ; রুচিবিজ্ঞানের কাজ হ'ল সাহিত্য সম্বন্ধে আইন তৈরী করা নয়—কোন্ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সাহিতের ক্রমবিবর্তন হয় তারই নির্দেশ দেওয়া।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমালোচকরা সাহিত্যবিচারে প্রায়ই লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর জোর দিয়ে এসেছেন। লেখকের যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব তাঁর লেখার মধ্যে পরিস্ফুট হ'য়েছে, তার দ্বারা তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজকে কিরূপভাবে প্রভাবান্বিত ক'রেছিলেন, সেটা দেখানোর জন্য সমালোচকেরা কি আপ্রাণ চেষ্টাই না ক'রেছেন। সেক্স্‌পীয়ার কিংবা টেনিসন্ যে তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা পারিপার্শ্বিক সমাজকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত ক'রেছিলেন একথা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু তাঁদের সামাজিক পরিবেশও যে সেক্স্‌পীয়ার এবং টেনিসনের সাহিত্য সৃষ্টিকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত

ক'রেছিল, গোঁড়া সমালোচকেরা এদিকটার উপর ততটা জোর দেন না। প্রবল ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য না থাকলে যে সাহিত্যিক হওয়া যায় না—সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু সমালোচকদের চেয়ে শিল্পীর শিল্পই বোধ হয় তাঁর ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ হ'তে পারে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। গোষ্ঠীগত, জাতিগত, শ্রেণীগত, আচারগত কতকগুলি উপাদানের সংমিশ্রণেই ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি; এই রাসায়নিক সংমিশ্রণের অনন্যসাধারণত্বেই ব্যক্তির অনন্যসাধারণত্ব। শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ ক'রে বিভিন্ন উপাদানের অন্তঃসমন্ধ নির্ণয় করা সমালোচনারই একটি প্রধান কাজ। সমালোচক এইভাবে শিল্পীকে পাঠকের কাছা-কাছি নিয়ে আসতে পারেন; শিল্পীর ব্যক্তিত্বের মত পাঠকেরও একটি ব্যক্তিত্ব আছে—তার গঠন প্রায় শিল্পীরই ব্যক্তিত্বের মত; শুধু ভাষার অভাবে তার বহিঃপ্রকাশ নেই। কাজেই এই যে লেখকের হৃদয় থেকে পাঠকের হৃদয়ে ভাবের আদান প্রদান—এতে সেতুর কাজ করে লেখকের অনন্যসাধারণত্ব নয়—তাঁর ব্যক্তিত্বের সাধারণত্ব। এই সাধারণত্বের মধ্য দিয়েই অনন্যসাধারণত্বকে বোঝা যায়। মানুষের সামাজিক সত্তা, পারিপার্শ্বিক, শিক্ষাসংস্কৃতি দিয়েই তার মনোবৃত্তির সাধারণত্ব গ'ড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক মানব-সমাজে এই সামাজিক অবস্থা প্রধানত শ্রেণীগত স্বার্থের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তাই সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতির বিভিন্ন আদর্শবাদের খাঁটি সমালোচনা করতে শ্রেণী-সচেতনতা আমাদের এত বেশী সাহায্য করে। বিশেষ ক'রে সাহিত্য এবং শিল্পের বিষয়ে একথাটা খুব বেশী ক'রেই খাটে—তার কারণ সাহিত্য ও শিল্প মানবমনের প্রবলতম, গভীরতম গুপ্ত সামাজিক কামনাই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

(সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যে অন্তর্যোগ আছে সে কথা অনেক গোঁড়া সমালোচকও স্বীকার করেন; তবে জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সাহিত্য-বিচারে তাঁরা বেশী দূর যেতে নারাজ। মাঝপথে যেয়েই

তাঁরা থমকে দাঁড়ান এবং ব'লে ওঠেন : "This far and no farther." এটা তাঁদের অবৈজ্ঞানিক মনের ভীরুতারই একটি নিদর্শন। সাহিত্য যদি সমাজের অনুগমন করে, তবে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সাহিত্যিক বিবর্তন হয় সে কথাও আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে হয়। কাজেই সাহিত্যের বিবর্তন বুঝতে হ'লে, আমাদের সর্বপ্রথম আয়ত্ত করতে হবে সামাজিক বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মগুলি। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে মার্ক্সের 'দ্বান্দ্বিক বস্তুতন্ত্রবাদ' (Dialectical Materialism) যে যুগান্তর এনেছে সেকথা আমরা সবাই জানি। প্রাণি-জগতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ডারউইনের দান যেমন অপরিসীম, মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে মার্ক্সের দানও তেমনি তুলনাহীন। যখন থেকে মানুষের সমাজ সৃষ্টি হয়েছে, তারপর থেকে সমাজে যে ওলট-পালট ভাঙা গড়া চ'লেছে, তার বিজ্ঞান সম্মত এত সুন্দর বিশ্লেষণ আর কেউ দিতে পারেনি। জার্মান দার্শনিকরা একটা অদৃশ্য শক্তিকে—যাঁকে তাঁরা বলেছেন 'Absolute Spirit', 'World spirit'—মানব সভ্যতার পরিবর্তনের মূলীভূত কারণ ব'লে নির্দেশ করতেন। কিন্তু মার্ক্স ছিলেন খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক—মানুষের বুদ্ধিশক্তিতে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি দেখালেন যে মানুষের ধনোৎপাদন প্রণালী ও তার পরিবর্তনই সর্বপ্রকার সামাজিক বিবর্তনের জন্য দায়ী। তাঁর এই নতুন মতবাদ প্রবর্তনের ফলে আজ সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতিতেও বহু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি মানুষের সৃষ্টি; মানুষ সামাজিক জীব—প্রচলিত ধনোৎপাদন প্রণালীর দ্বারাই সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়—তার মনোবৃত্তি নির্ধারিত হয়। কাজেই তার সৃষ্টিতে এর ছাপ না থেকেই পারে না। মানুষের ধর্ম, নীতি, রুচি প্রভৃতি সব কিছুই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ফল—তাই তার শিল্প, সাহিত্য দর্শনেও তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম, নীতি ও রুচির ছাপ পড়া স্বাভাবিক। সমাজ ছাড়া ধর্ম, নীতি, রুচি

প্রভৃতির যেমন কোন স্বয়ংসিদ্ধ অস্তিত্ব নেই, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শনেরও তেমনি সমাজ-নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। এরা সবাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বটে—তবে এদের রূপ নির্ধারিত হয় একই সমাজ-ব্যবস্থার ফলে। বৈজ্ঞানিক জড়বাদ বস্তু-জগতের ঊর্ধ্বে কোন ভাব-জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। আদর্শবাদীর কাছে ভাব-জগতই সব কিছু, বস্তু-জগৎ ভাব-জগতের প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু জড়বাদীর কাছে বস্তু-জগতই খাঁটি সত্য—মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবৈজ্ঞানিক মন নিজের কল্পনা দিয়ে বাস্তবকে অলীক ভাবরাজ্যে টেনে তোলে। এই ভাবজগৎ যে কত অলীক, তা মহাকবিদের কাব্য আলোচনা করলেই বোঝা যায়। যুক্তি নেই, নিছক বিশ্বাসের উপরেই এর অস্তিত্ব। কবিরা বাস্তবের প্রতিরূপ হিসাবেই তাঁদের ভাব-জগৎ সৃষ্টি করেন। উদাহরণ স্বরূপ মিল্টনের 'প্যারাডাইজ্ লষ্টের' উল্লেখ করা যায়। মিল্টনের সৃষ্ট ভগবান ইংলণ্ডের তৎকালীন স্বেচ্ছাচারী রাজা চার্লসেরই প্রতিরূপ—শুধু আকৃতি ও আয়তনে বড়। স্বর্গ ও নরক বর্ণনায়ও মিল্টন তাঁর মানব-সুলভ সীমাবদ্ধ কল্পনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। এর কারণ কি? এর কারণ কি এই নয় যে প্রকৃত ভাব-জগৎ বলে কোন কিছুই নেই? ভাব-জগৎ মানুষেরই বুদ্ধিবিকারের নিদর্শন মাত্র।

আজকের সাহিত্য বিচার হৃদয়াবেগের পথ ছেড়ে এসেছে বুদ্ধির পথে। সাহিত্যের বিবর্তন যে একটা বিশেষ স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালন করে চলে, আধুনিক সমালোচক বুদ্ধি দিয়ে তারই অনুধাবন করতে চায়। কোন বিশেষ যুগে কোন বিশেষ সাহিত্য কেন জন্মাল—কেন অন্য সাহিত্য জন্মাল না—এই তার বিচার্য বিষয়। হোমার ইচ্ছা করলে সেক্স্‌পীয়ার হতে পারতেন না। সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভার দিক দিয়ে কেউ হয়ত কারও চেয়ে কম যান না—অথচ দুজন এমনই দুটি বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি যে একজনের পক্ষে আরেকজনের মত হওয়া অসম্ভব। মানবসমাজ বিভিন্ন অন্ত-

দ্বন্দের মধ্য দিয়ে নিরন্তর অগ্রসর হয়ে চলেছে—পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ তার নেই। পথে মণিমুক্তা যা কিছু অর্জন করেছে সবই তার ঐতিহ্যের কোঠায় জমা হ'য়ে আছে, সে ঐতিহ্যের আদরও আছে তার কাছে—কিন্তু শুধু ঐতিহ্য নিয়ে ব'সে থাকলে তার চলবে না। তার সামনে প'ড়ে আছে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ—যে ভবিষ্যতে তার সমাজ ব্যবস্থা, তার সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতি মানুষের অতীত কীর্তিকে ম্লান ক'রে দেবে। অনেক সাহিত্য-সমালোচক আছেন যাঁরা মনে করেন যে মানুষের ইতিহাস চক্রাকারে ঘোরে—কিন্তু এ ধারণায় কিঞ্চিৎমাত্র সত্য নেই। ইতিহাস ক্রমোন্নতির পথে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে—এখানে ওখানে বাধার সে সাক্ষাৎ পাবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বাধাকে অতিক্রম ক'রে তার অগ্রগতিকে সে সার্থক করে তুলবেই। বর্তমানে সামাজিক ক্রম-বিবর্তনের পথে কি ক'রে সাহিত্যিক ক্রমবিবর্তন সম্ভব হ'ল তারই একটু আলোচনা ক'রে দেখি। মানুষ সামাজিক জীব এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষ যে আদিম অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য সমাজবদ্ধ হ'য়েছিল রাজনৈতিক মতবাদ সে কথা স্বীকার করে। শুধু বন্যজন্তুর আক্রমণের আশঙ্কায় নয় বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায়ও তাকে দলবদ্ধ হ'তে হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় এই দলের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ ছিল না। কিন্তু কৃষিকার্য প্রভৃতির উদ্ভাবনের ফলে মানব সমাজে ধনোৎপাদন শুরু হ'ল এবং শ্রেণী-বিভাগও শুরু হ'ল। এইভাবে ধীরে ধীরে রাজশক্তি, যাজক-শক্তি, প্রজাশক্তি প্রভৃতির উদ্ভাবন হ'ল। সভ্যতার পথে মানুষের জয়যাত্রার শুরু হ'ল। এই আদিম শ্রমবিভাগ কি ক'রে ধীরে ধীরে জটিলতর হয়ে উঠল তার আলোচনা করা এখানে অবান্তর হবে।

আজ ধর্মের আশ্রয়স্থল ঈশ্বরের একটা সনাতন শাশ্বত মূর্তি কল্পনা করা হয়। কিন্তু ধর্মের মত ঈশ্বরও শাশ্বত নন। আদিম মানুষের ধর্ম-সৃষ্টি হয়েছিল প্রাকৃতিক বস্তু-সঞ্জাত ভয় এবং বিস্ময় থেকে।

তখনকার সরল মানুষ অনেক বিস্ময়জনক প্রাকৃতিক ঘটনার সন্তোষজনক কারণ নির্দেশ করতে পারত না বলেই, এই দুর্জ্ঞেয়তাকে দেবত্বের সম্মান দিত। এমনি ক'রে বহু দেবতার সৃষ্টি হ'য়েছিল। ধর্মের এই জন্ম-কাহিনী যে কত সত্য তা' আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন জাতির আদিম ইতিহাস আলোচনা ক'রে—আদিম অবস্থায় প্রত্যেক জাতিই ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশের ফলে এবং ধর্মের বিবর্তনের ফলে আজ সভ্যজগতের প্রায় ধর্মই একেশ্বরবাদী। আজ সভ্যজগতের বেশার ভাগ লোক পরিপূর্ণ যুক্তি দিয়ে জড়বাদী বিজ্ঞানকে মেনে নিতে পারে না ব'লে একা ঈশ্বর এখনও টিকে আছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার গতি হ'চ্ছে নিরীশ্বরবাদের দিকে। এক সময়ে ধর্ম হয়ত মানুষকে আবেগ ও প্রেরণা যোগাত; কিন্তু ধর্ম সে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে বহুদিন। আধুনিক যুক্তির কাছে অবৈজ্ঞানিক ধর্মমত টেকেনি। তবু যে ঈশ্বর টিকে আছেন, সে শুধু মানুষের অন্তর্নিহিত গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কারের জন্য। শীঘ্রই এমন দিন আসবে যেদিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রথম মানুষের এই অন্ধবিশ্বাসের ফলে পুরোহিত সমাজ দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে বেশ কায়েমী আসন ক'রে নিল। শুধু তাই নয় রাজশক্তির কপালেও এই পুরোহিত সমাজই দেবত্বের জয়টিকা পরিয়ে দিল। এরপর থেকেই শুরু হ'ল মানবসমাজের শোষণের ইতিহাস। নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থকে কায়েমী ও পরিপুষ্ট করার জন্য যাজকসমাজ সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি সব কিছুরই পায়ে পরিয়ে দিল ধর্মের শৃঙ্খল। লোকের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে স্বাভাবিক স্বাধীন চিন্তা-শক্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা করা হল। শুধু যে সমাজের কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীই যাজক ও শাসকশক্তির চাপে প'ড়ে তাদের ব্যক্তিত্ব হারাল তা' নয়—সতীত্বকে ধর্মের অঙ্গীভূত ক'রে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ-লব্ধ নারীর যৌন-স্বাধীনতা হরণ করা হ'ল। নানারকম

সামাজিক বিধিনিষেধের সৃষ্টি ক'রে নারীকে পুরুষের দাসীতে পরিণত করা হল। পাশ্চাত্যের অনেক সমাজে নারীর অবস্থা আজ যথেষ্ট উন্নত হ'য়েছে কিন্তু আমাদের সমাজের নারীরা আজও 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই নিমজ্জিত। নিজের দেহ দিয়ে পুরুষের তুষ্টিবিধান করা ছাড়া মেয়েদের যেন আর কোন স্বাধীন সত্বা নেই। যাক্, সমাজের প্রথম অবস্থায় দেখা যায় যে মানুষের মধ্যে ধর্মভাব অত্যন্ত প্রবল। সাধারণের ধর্মভাবের সুযোগ নিয়ে শাসক-সমাজ ধর্মকে কেন্দ্রীভূত ক'রে নিজেদের স্বার্থরক্ষার উপযোগী ক'রে এক সংস্কৃতি গড়ে তুললেন। এই সংস্কৃতি যে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গড়ে তুললেন তা নয়। অনেকটা অচেতনভাবেই এর গোড়া পত্তন হল। এই সংস্কৃতির মূলে যে অন্যকে শোষণ করার ইচ্ছাই প্রবল ছিল তাও নয়—তাঁরা মনে ক'রেছিলেন যে তাঁদের যাতে ভাল হবে সবারই মঙ্গল বোধ-হয় তারই মধ্যে নিহিত। এই যে ধর্মমূলক সংস্কৃতি এরই বিকাশ দেখি আমরা প্রথম যুগের মানুষের সাহিত্যে। সমাজ-ব্যবস্থা প্রায় প্রত্যেক দেশেই একই রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়েছে। তাই পৃথিবীর প্রত্যেক আদিম জাতির সাহিত্যের মধ্যেই আন্তরিক যোগ আছে। হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি, বাল্মীকি ও বেদব্যাসের রামায়ণ এবং মহাভারত—এদের চিন্তাধারার মধ্যে আশ্চর্য রকম মিল আছে। সেই প্রবল ধর্মভাব, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুতে দেবত্ব আরোপ (Nature myth), নারী-হরণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি সবই প্রায় মিলে যায়। এতে আশ্চর্যান্বিত হবার বিশেষ কিছু নেই। তৎকালীন ভারতীয় সমাজের ধনোৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে গ্রীসীয় ধনোৎপাদন প্রণালীর যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল—ফলে সমাজব্যবস্থাও ছিল একই রকমের। এই একই রকমের সমাজব্যবস্থার ফল এই মহাকাব্যগুলি ঃ তাই তাদের এই সাদৃশ্য।

এরপরেই ইউরোপের ধর্মজীবনে এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল। যীশু খ্রীস্টের আবির্ভাবে খ্রীস্টধর্মের সূত্রপাত হ'ল। সর্বব্যাপী পৌত্তলিকতার

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একেশ্বরবাদী খ্রীস্টধর্মকে যে কি প্রবল যুদ্ধ করতে হ'য়েছিল ইতিহাসে সে কথা আছে। খ্রীস্টীয় প্রথম যুগের ইংরজী সাহিত্যে আমরা পৌত্তলিকতা ও একেশ্বরবাদের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখতে পাই। আদি রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্মেও কিন্তু অনেক যুক্তিবিরুদ্ধ আচার অনুষ্ঠান ছিল। তাই মধ্যযুগ পর্যন্ত লোকের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের প্রশ্রয়েই খ্রীস্টধর্ম বেড়ে উঠতে লাগল। খ্রীষ্টীয় যাজক সম্প্রদায় সাধারণ লোকের জ্ঞানচর্চা নিষিদ্ধ করে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ কায়েমী ক'রে রাখলেন। শাসক এবং যাজকের সহযোগিতায় সামাজিক শোষণপদ্ধতি পূর্বের মতই অপ্রতিহত গতিতে চল্‌তে লাগল। এই সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় সাহিত্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যাজক-সমাজেরই সৃষ্টি। কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় তখন তাঁদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। তাই এই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্যে ধর্ম ও নীতির ছড়াছড়ি ঃ নানাদিক থেকে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশের পথ প্রতিরোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। শ্রেণী-সচেতন এই যাজক ও শাসক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করল না। সামন্ত-তান্ত্রিকতার মধ্যে তার ধ্বংসের বীজও উপ্ত ছিল। সামন্ততান্ত্রিকতার আওতায় যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে শ্রেণী-সচেতন হ'য়ে উঠছিল, তারই হাতে একদিন সামন্ততান্ত্রিকতারও অবসান ঘটল। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল। প্রধানত দুটি কারণে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান সম্ভব হল ঃ প্রথমত রেনেশাঁস্ (Renaissance) বা জ্ঞানবিপ্লব এবং দ্বিতীয় ধর্মবিপ্লব বা রিফর্মেশন্ (Reformation)। জ্ঞান-বিপ্লবের ফলে আবার সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হ'ল। যাজক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া জ্ঞানের অধিকারে আঘাত লাগল। দ্বিতীয়ত জার্মাণীতে মর্টিন্ লুথারের ধর্ম-বিপ্লবের ফলে রোমান ক্যাথলিসিজ্‌মের অনেক অন্ধ সংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদকে ছেঁটে ফেলে প্রোটেস্টান্টিজ্‌ম্ জন্ম নিল। এর ফলে যাজক

ও শাসক সম্প্রদায়ের সম্মান ও প্রতিপত্তি বহু পরিমাণে হ্রাস পেল। এর ফলেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়া পত্তন হ'ল। অবশ্য এই বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে একদিনেই শাসক ও যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা অধিকার ক'রে নিল এমন নয়ঃ সামন্ততন্ত্রের চরম অবসান ঘটাতে বহু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হ'য়েছিল। এই ধর্ম-বিপ্লব ও জ্ঞান-বিপ্লবের ফলেই ইংলণ্ডে সেক্স্‌পীয়ারের মত ব্যক্তি-সাতন্ত্র্যবাদী নাট্যকারের আগমন সম্ভব হ'য়েছিল। তাঁর নাটকে আমরা প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের অদৃষ্টবাদের সন্ধান যেমন পাই না, তেমনি পাই না মধ্যযুগীয় খ্রীস্টধর্মের অন্ধ বিশ্বাস এবং প্রবল হৃদয়াবেগ। এদের পরিবর্তে তাঁর নাটকে আমরা পাই প্রেম, ঈর্ষা, প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রভৃতি ব্যক্তিগত জীবনের অতি স্বাভাবিক হৃদয়-বৃত্তির প্রকাশ। মধ্যবিত্ত জীবনের নবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে তাঁর নাটকগুলি সমুজ্জ্বলঃ মার্লোর ফাউস্ট বা গ্যেটের ফাউস্টের মধ্যেও এই নবলব্ধ স্বাধীনতা ও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির জয়গান। এঁরা সবাই প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন—এঁরা সবাই উৎকৃষ্ট রস-সাহিত্য রচনা ক'রে গেছেন; কিন্তু এঁদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে শ্রেণী-সচেতনতার ছাপ প'ড়ে গেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ র'য়ে গেছে। সমাজ-জীবনে কোন আবর্তন এলে, তার ছোঁয়া সাহিত্যের গায়ে না লেগেই পারে না।

ধর্ম বিপ্লবের ফলে খ্রীস্টধর্মের অনেক কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দূরীভূত হ'ল বটে কিন্তু ঈশ্বর বেঁচে রইলেন। তার কারণ বুর্জোয়া সমাজ কখনও পুরোদস্তুর বিপ্লবী হ'তে পারে না—সমাজের শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করা তাদের পক্ষে অপরিহার্য। তাই ধর্মের প্রতিভূ হ'য়ে ঈশ্বর বেঁচে রইলেন। ধর্মের নামে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত কিছু অন্যায় অত্যাচার চ'লে এসেছে, আর কারও সঙ্গে তার তুলনা চলে না। রক্ষণশীলতা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম—তাই ছাড়ি ছাড়ি

করেও মানব-সমাজ আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের হাত থেকে মুক্তি পায় নি। একটা বৈজ্ঞানিক সাহসিকতার অভাবে ঈশ্বর আজও বেঁচে আছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা কোন অজ্ঞেয় অপ্রতক্ষ্য শক্তির মধ্যে জগৎস্থষ্টির আদিকারণ অন্বেষন করেন না। তাঁদের মতে জগৎ স্থষ্টির আদি কারণ বস্তুজগতের মধ্যেই সূক্ষ্মতম উপাদান হিসাবে বিদ্যমান আছে। ক্রমবিবর্তনাভিমুখী গতির ফলে তাদেরই বিভিন্ন সংমিশ্রণে বস্তুজগৎ, প্রাণীজগৎ প্রভৃতির স্থষ্টি হ'য়েছে। মার্ক্সের পূর্বগামী জড়বাদী দার্শনিকরা বস্তুতন্ত্রকে একনিষ্ঠ ভাবে মেনে নিতে পারেন নিঃ আদর্শবাদের সঙ্গে তাঁরা বস্তুতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন ব'লে তাঁদের দর্শন সম্পূর্ণ হয় নি'। আদর্শ জগতের সঙ্গে বস্তুজগতের মিলন কখনও সম্ভব হয়নি'—অথচ তাঁরা এই প্রচেষ্টার পিছনে আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। মার্ক্সই সর্বপ্রথম বস্তুতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংস্থাপিত করেন এবং দ্বান্দিক জড়বাদের সাহায্যে মানুষের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত অর্থ প্রদান করেন। কিন্তু বুর্জোয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁর মতবাদকে বিশ্বাস করতে চান না। কারণ তিনি ব'লেছেন যে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে এবং এই ধ্বংসের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হ'য়েছে। ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুসারে বুর্জোয়া সমাজকে শ্রমিক সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তারপর এই শ্রমিক সমাজের হাত দিয়েই শ্রেণীহীন সমাজের স্থষ্টি হবে—তখনই আসবে মানবসমাজের প্রকৃত মঙ্গল। বুর্জোয়া সমাজ যে আজ ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ক'রেছে সেটা সম্ভব হ'য়েছিল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন ক'রে। ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই আবার তাকে ধ্বংসের দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রের যে আজ সমূহ বিপদ আসন্ন—এই আন্তর্জাতিক যুদ্ধ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

ধনতন্ত্রের আওতায় বুর্জোয়া সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে—

তার ফলে নিত্য নতুন সাহিত্যেরও সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু এর কোন পরিবর্তনই পুরোমাত্রায় বৈপ্লবিক নয়ঃ এতে বুর্জোয়া সমাজের জীবনে কোন প্রবল বিক্ষোভ উপস্থিত হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতি ও যন্ত্রশিল্পের অভিযানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতির দ্বারা বুর্জোয়া ধনতন্ত্র নিজেরই ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত ক'রেছে বলা যেতে পারে—কারণ এর ফলে সমাজে বুর্জোয়া-ধনতন্ত্র-বিরোধী একটা বৃহৎ শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক সমাজের সৃষ্টি হ'য়েছে। বুর্জোয়া-ধনতন্ত্র যে ইচ্ছা করেই এই সব পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা নয়; পরিবর্তনই ধনতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। ধনতন্ত্রের জগতে স্থায়ী বলে কিছু নেই—কোন কিছু স্থায়িত্ব পাবার আগেই তার রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের ফলই আজকের দিনের ফ্যসিজম্, নাৎসীজম্ প্রভৃতি মতবাদ। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সুখসম্পদ প্রভৃতির দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীই বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের গৌরবময় যুগ। এই যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতিই বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যখন সেই সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী লোকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আদান প্রদান শুরু হয় তখনই সেই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয়। জনগণও এইসব সামাজিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে, যদিও এ আন্দোলনের সঙ্গে তাদের আন্তরিক যোগ নাও থাকতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক, দার্শনিক, শিল্পী প্রভৃতির সঙ্গে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের এমনই একটা মিলন সংঘটিত হ'য়েছিল যার ফলে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র একটা সংস্কৃতির বন্যা নেমে এসেছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির দিক দিয়ে রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। আমাদের বাংলাদেশেও মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই যুগেরই মানুষ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে গত মহাযুদ্ধের পর থেকে ধনতন্ত্রের যেন ক্ষয় শুরু হ'য়েছে। আধুনিক সাহিত্য, আধুনিক দর্শন যেন আর ধনতন্ত্রের

স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্টি লাভ করতে পারছে না। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান যেন নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে। একটা নতুন আদর্শ, একটা নতুন সৃষ্টি-প্রেরণা যেন আধুনিক শিল্পী ও সাহিত্যিকের মধ্যে রূপ নেবার চেষ্টা করছে। আগামী যুগের সাহিত্য ও শিল্পের রূপ হবে পূর্বগামী সব সাহিত্যের চেয়ে ভিন্ন। বর্তমানের ভাঙন-ধরা বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতার আড়ালে নতুনের এই প্রসব-বেদনা স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে ঃ তবে তার ভূমিষ্ঠ হবার শুভলগ্ন আজও হয়ত আসে নি।

বুর্জোয়া সংস্কৃতি, বুর্জোয়া সাহিত্য প্রভৃতি নামে আমাদের দেশের অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকের আপত্তি আছে। তাঁরা মনে করেন যে বুর্জোয়া কথাটা বুঝি গালাগালি কিন্তু এ কথাটার এরূপ কোন বিকৃত অর্থ নেই। বুর্জোয়া কথাটা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনই সূচিত করে। আধুনিক মানব সভ্যতার ইতিহাসে বুর্জোয়া সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দান অপরিসীম। আমাদের একথা ভূলে গেলে চলবে না যে বুর্জোয়া ধনতন্ত্র যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রেছিল—তখন তার প্রকৃতি ছিল বৈপ্লবিক। কিন্তু সমাজব্যবস্থায় ধীরে ধীরে তার আসন যখন কায়েমী হ'য়ে গেল—সামন্ততান্ত্রিকতার পূর্ণ উচ্ছেদ হ'ল—তখন বুর্জোয়া ধনতন্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পর্যবসিত হ'ল। বুর্জোয়া ধনতন্ত্রই আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে বর্তমান উন্নতির পথে টেনে এনেছে। সাহিত্য আজ জাতীয়তার ঊর্ধে উঠে আন্তর্জাতিকতার রূপ পেয়েছে এই বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের কল্যাণে। নিজেদের সমাজ-ব্যবস্থাকে অটল রাখার জন্য বুর্জোয়া ধনতন্ত্রকে অভিযান চালাতে হ'য়েছে দেশ দেশান্তরে—ফলে জাতীয়তার বন্ধন অনেকটা ঘুচে গিয়ে আজ আন্তর্জাতিকতার আবহাওয়া দেখা দিয়েছে। জাতীয় সাহিত্যের স্থানে আজ বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হ'য়েছে। এই বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট ফল আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

এই সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জন্ম অসম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অস্বাভাবিক সাহিত্য-প্রতিভা ছিল ব'লেই তিনি বাংলা সাহিত্যের দুইশ-বছরের ইতিহাসকে নিজের মধ্যে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে বিভিন্ন যুগবিভাগ দেখতে পাই—বাংলা সাহিত্যে সে রকম স্পষ্ট যুগবিভাগ নেই বল্‌লেই চলে। তার কারণ একা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের পরম্পরানুগামী কয়েকটি যুগ রূপ লাভ ক'রেছে। এই কার্যে ইংরেজী সাহিত্য যে রবীন্দ্রনাথকে অনেকটা সাহায্য ক'রেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন জাতির সাহিত্যের মধ্যে এই যে যোগাযোগ এটা সম্ভব হ'য়েছে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রেরই কৃপায়।

তবে পৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে দিন শেষ হ'য়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে অবশ্যম্ভাবী অন্তদ্বন্দ্বের ফলে পৃথিবী থেকে ক্ষেত্রদাস প্রথা (Serdom) ও সামন্ততন্ত্র (Feudalism) বিদায় নিয়েছে, তারই ফলে ধনতন্ত্রকেও বিদায় নিতে হবে। কারণ ইতিহাসকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। যে বৈষম্য ও অবিচারের ভিত্তিতে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সে সমস্যার কোন সমাধান আজ পর্যন্ত তার দ্বারা সম্ভব হয়নি এবং হবে না—ফলে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শ্রমিক সমাজের কাছে তার পরাজয় অনিবার্য। নানারূপ সাময়িক প্রলেপ দিয়ে কিছুদিন পর্যন্ত তার আয়ু বাড়িয়ে রাখা চলতে পারে বটে (ফ্যাসিজম্ ও নাৎসীজম্ যা করার চেষ্টা করেছে) কিন্তু ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবিতার হাত এড়ানো চলে না। তাই আজ পৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমূহ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে—সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য এবং বিজ্ঞানেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ধনতন্ত্রের মুখপাত্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টিক্ষমতা আজ যেন চর্বিত চর্বণে নিঃশেষিত হ'তে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে যে সৃষ্টির বন্যা এসেছিল—সে বন্যার আয়ু শেষ হ'য়ে গেছে, পিছনে ফেলে রেখে গেছে শুধু শুষ্ক চড়া। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের

সাহিত্যিকেরা শুধু নতুন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন— তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে পুরানো পথে আর কোন সম্ভাবনা নেই। লোকের দৃষ্টি এখন ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ।

আজ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে এই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার কারণ প্রচলিত সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে আর সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছেন না। এলিয়টের ভাষায় বল্‌তে হয় তাঁদের মনের অবস্থা হ'য়েছে 'Waste Land' বা পোড়ো জমির সামিল। সেখানে বীজ বপন করে সুফল লাভের আশা খুব কম। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে যে বিপদ্‌পাত হয়েছিল, তাতে অনেকেই বর্তমান সমাজব্যবস্থার ফাঁকি ধর্‌তে পেরেছিলেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি যে বালির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিয়েছিল ঃ এই সামাজিক অস্থিরতা ও আদর্শহীনতা থেকেই এলিয়টের প্রথম জীবনের নৈরাশ্যবাদী কবিতা-গুলির সৃষ্টি হ'য়েছিল ; তাই তিনি গেয়েছিলেন ঃ

"We are the hollow men
We are the stuffed men."

কিন্তু এরকম নৈরাশ্যবাদ নিয়ে ত মানুষের বেশীদিন চলে না। নৈরাশ্যবাদ বড় ভয়ংকর জিনিষ, এর ফলে মানুষ যেমন বিপ্লবী হ'তে পারে—তেমনি আবার প্রচলিতের সঙ্গে সন্ধি ক'রে সংস্কারপন্থীও হ'য়ে উঠতে পারে। মিঃ এলিয়ট অবশ্য শেষোক্ত পন্থাই বেছে নিয়েছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাময়িক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হ'য়ে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবিদের দলে ভিড়েছেন। বর্তমানে তাঁর স্বরূপ হ'চ্ছে ঃ "a classicist in literature, a royolist in politics and an Anglo-Catholic in religion" তাঁর নিজের সম্বন্ধে নিজেই তিনি একথাগুলি ব'লেছেন। এর ফলে তাঁর আর্থিক ও সমাজিক সাফল্য হয়ত হ'য়েছে কিন্তু 'The Waste Land'-এর মত শক্তিশালী ভাঙনধরা সমাজের

চিত্রমূলক কোন কাব্য আর তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় নি। কিন্তু মানবসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার মত বোধ হয় কিছু নেই ; বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতাই মানুষের ইতিহাসে শেষ কথা নয়। এরও পরে মানুষের ইতিহাস আছে এবং সেইটেই হয়ত তার সবচেয়ে গৌরবময় ইতিহাস হবে। আজ চতুর্দিকে যে নিরাশার কালো অন্ধকার দেখা যাচ্ছে তারই মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের আশার ক্ষীণ আলোও দেখা যায়। এলিয়টের অনুগামী অনেক তরুণ ইংরেজকবি ও সাহিত্যিকের মধ্যে আমরা আশার সঞ্চার দেখ্‌তে পেয়েছি : তাঁরা নিজেদের যুক্তিবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও সাহিত্যরীতির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে বসেন নি'। তাঁরা তাই বলিষ্ঠ লেখনীতে বলিষ্ঠ বাস্তবের চিত্র এঁকে চ'লেছেন তাঁদের সাহিত্যে। তাঁদের এ সাহিত্য অনেকক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল পণ্ডিত সমালোচকদের সমর্থন পায় নি—কারণ এতে নাকি রস-বিচ্যুতি ঘটেছে। কিন্তু সমালোচকরা একটা কথা ভুলে যান যে সাহিত্যের রস এবং রসাদর্শ এক নয়। সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রীতি এবং আদর্শ অনেকক্ষেত্রেই বদ্‌লে যায়। বর্তমান সোভিয়েট রাশিয়ার সাহিত্যের দিকে তাকালেই আমাদের একথাটা প্রমাণিত হ'য়ে যায়। অ্যারিস্টোট্‌লএর 'Poetics' বইটার নাম আমরা অনেকেই জানি। এই সমালোচনার বইখানাতে তিনি নাটকের যে যে লক্ষণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে গ্রীক নাট্যকার ঈস্‌কিলাস্‌, সোফোক্লিস্‌, ইউরিপিডিস্‌ প্রভৃতির নাটক মিলে গেলেও সেকস্‌পীয়ারের অনেক নাটক মেলে না। তাই ব'লে কি আমরা বল্‌ব যে সেক্‌স্‌পীয়ারের রচনাগুলি নাটক হয় নি? তেমনি সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের আদর্শ হুবহু ইব্‌সেন বা শ'র মধ্যে খুঁজ্‌তে যাওয়াও ভুল। সেক্‌স্‌পীয়ার ও বার্ণার্ড্‌ শ' একই ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় মানুষ—অথচ তাঁদের রচনাতেও এমনি আদর্শের গরমিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে নতুন সাহিত্যের জন্য নতুন

রুচি-বিজ্ঞানের প্রয়োজন। পুরাণো রুচি দিয়ে নতুন সাহিত্যকে বিচার করা চলে না। এই প্রাচীন-পন্থী রুচি-বিজ্ঞানবিদ্‌রা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র মেনে নিলেও সমাজ ও সাহিত্যের গতিশীলতা ও পরিবর্তন বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন যে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস চক্রাকারে ঘোরে—কিন্তু ইতিহাসের এই বিকৃত অর্থ যে কত মিথ্যা তা' প্রমাণ করবার জন্য যুক্তির দরকার হয় না। অনেক ধ্বংস-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে মানুষের ইতিহাস উত্তরোত্তর এগিয়ে চলেছে: আপাতদৃষ্টিতে তার অগ্রগতি রুদ্ধ ব'লে মনে হ'লেও, অগ্রগতি যে হ'চ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইতিহাসের চাক্রিক আবর্তনে যে-সব সমালোচক বিশ্বাস করেন—তাঁদের মতে সাহিত্যের বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় তার প্রকাশভঙ্গীর। এই প্রকাশ-ভঙ্গীর নতুনত্বের উপর নির্ভর ক'রেই সাহিত্যে যুগবিভাগ হয়। কিন্তু আমরা জানি যে শুধু মাত্র ভাষা বা আঙ্গিককে অবলম্বন ক'রে স্থায়ী সাহিত্যিক আন্দোলন চলে না। লেখক বিদ্রোহ করেন তখন যখনই প্রচলিত ভাষা বা আঙ্গিক তাঁর ভাবপ্রকাশের সহায়তা করে না। নতুন বিষয়বস্তু থাকে বলেই নতূন প্রকাশভঙ্গীর প্রয়োজন হয়। যাঁদের বক্তব্যে নতুনত্ব থাকে না, যাঁরা শুধু আঙ্গিকের অভিনবত্বে পাঠক সমাজকে চমক লাগানোর প্রয়াস পান, তাঁদের কৃতিত্ব থাকতে পারে কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক অবদান সন্দেহজনক। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও কতিপয় আধুনিক কবি শুধু মাত্র আঙ্গিকের অভিনবত্বে আসর জমানোর ব্যর্থ প্রয়াস ক'রে একথা মর্মে মর্মে বুঝ্‌তে পেরেছেন। যদি এই সমালোচকদের কথা সত্য ব'লে ধ'রে নিতে হয় তবে সাহিত্যে নতুন আন্দোলন আনার জন্য কয়েকখানি প্রামাণ্য অভিধানই বোধ হয় যথেষ্ট। হাতের কাছে বিশ্ব সাহিত্যের কয়েকখানি ভাল ভাল বই রেখে—নতুন ভাষায় সেগুলি রূপান্তরিত কর্‌লেই ত ভাল সাহিত্যসৃষ্টি হ'তে পারে। কিন্তু তা'

হয় না। প্রত্যেক যুগের সাহিত্যই প্রাচীন সাহিত্যের ভাণ্ডারে বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের দিক থেকে নতুন কিছু দান করে। আঙ্গিকের দিক থেকে সাহিত্য পুরানো আঙ্গিককেই নতুনত্ব দেয় এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে সাহিত্য এমন কতকগুলি সুনির্ধারিত দাবী জানায় যার মূল শ্রেণীগত স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সাহিত্যের এই দ্বৈত রূপ সর্বত্রই দেখা যায়। শ্রেণীগত রূপের মধ্যে ব্যক্তিগত রূপও নিহিত থাকে, কারণ ব্যক্তিই শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। এর একটা জাতীয় রূপও থাকে কারণ এই জাতীয় রূপ মানেই শাসক শ্রেণীর রূপ এবং শাসকশ্রেণীই যে সাহিত্যের রক্ষক এবং পরিপোষক তা' আমরা জানি। এই বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের ভাষা ও আঙ্গিকের উপর জোর দিলে, তার প্রাণশক্তিকে ছেড়ে কঙ্কালকেই বেছে নেওয়া হয়। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে অনেক তথাকথিত বিজ্ঞ সমালোচক এই ভুল করেন।

সাহিত্যের শাশ্বত সনাতন কোন রূপ যে নেই একথা অতি সত্য। তা যদি থাকৃত তবে সব সাহিত্যই বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ভবভূতির অনুগামী হ'ত। সাহিত্যসৃষ্টির এত নব নব বৈচিত্র্য তবে আমরা পেতাম না। সাহিত্যের এই পরিবর্তন সম্ভব হয়, সমাজের সঙ্গে তার আন্তরিক যোগ আছে ব'লেই। অর্থনৈতিক কারণেই সমাজ বদ্‌লায়, নীতি বদ্‌লায়, ধর্ম বদ্‌লায় সাহিত্য বদ্‌লায়। সাহিত্যের মত ধর্মেরও তাই কোন সমাজ-নিরপেক্ষ রূপ নেই। যে সমাজ-ব্যবস্থা যত উন্নত তার ধর্মও তত উন্নত। আজ যদি আমি ঝড়কে দেবতা জ্ঞানে পূজো করি, তবে সবাই আমাকে উপহাস করবে। প্রাচীন যুগের লোকদের কাছে ঝড়ের দেবত্ব ছিল কিন্তু আমরা সভ্য হ'য়েছি ব'লে সে দেবত্ব আজ খ'সে পড়েছে। অথচ সমাজে যাঁরা শিক্ষিত ব'লে গর্ব করেন আজও অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে তাঁদের মুক্তি হয় নি— এখনও দেবদেবীর পূজো চলছে, নিজেদের যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে অন্ধবিশ্বাসে চল্‌ছে ভগবদ্‌ভক্তি। এর একমাত্র কারণ এই যে

মানুষের কাছে ঐতিহ্য ও সংস্কারের শক্তি বড় প্রবল। তাই বিশুদ্ধ বুদ্ধির জোরে ব্যষ্টি-জীবন সংস্কারমুক্ত হ'য়েছে বটে কিন্তু সমষ্টি-জীবন এখনও অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন। এর ফলেই লোক এ জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়ে অলীক পারত্রিক জগতের সুখের আশায় ব'সে থাকে। সমাজের এই রূপ ব'লেই আজকের সাহিত্য এখনও বিশুদ্ধ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে নি। তবে আধুনিক সাহিত্য ধীরে ধীরে যে সেদিকে এগুচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আধুনিক সাহিত্য যখন বুদ্ধি ও যুক্তির উপর জোর দেয় তখন অনেকেই মনে করে যে এ সাহিত্য বুঝি হৃদয়াবেগকে ছেঁটে ফেল্‌তে চায়। কিন্তু সে কথা সত্য নয়; কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাস এবং হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে এর অভিযান হ'তে পারে কিন্তু বুদ্ধি-বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে এর কোন অভিযোগ নেই। মানুষের কাছে সংস্কার জিনিষটা এতই বড় যে নিজেকে মানুষ হিসাবে দেখতে সে ভয় পায়। মানুষকে যদি বলা যায় যে চাঁদের অংশ দিয়ে তার দেহ তৈরী হ'য়েছে—এই অবৈজ্ঞানিক কথা তাকে অতি সহজেই বোঝানো যাবে। অথচ তাকে যদি বোঝানো যায় যে প্রচলিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সামাজিক পরিবেশের ফলেই তার হৃদয়-বৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি গ'ড়ে উঠেছে—তবে এই অতি সত্য বৈজ্ঞানিক মতবাদ গ্রহণ কর্‌তে তার অনেক সময় লাগবে। তার একমাত্র কারণ এই যে বৈজ্ঞানিক মতবাদ তার ঐতিহ্য-বোধ ও সংস্কারে আঘাত করে। মানুষের এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার ফলেইআদর্শবাদী দর্শন এতদিন পর্যন্ত তাকে বিভ্রান্ত ক'রে এসেছে। এর ফলেই হেলেনিজ্‌ম্‌, রোমান্টিসিজ্‌ম্‌, মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক মতবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে। সাহিত্যে এইসব মতবাদের আগমন খুব স্বাভাবিক এবং তাদের প্রয়োজনও আজ ফুরিয়েছে। এ পথে যা কিছু সম্ভাবনা ছিল. তা আর অনাবিষ্কৃত নেই। তবু আমাদের সমসাময়িক সাহিত্যেও এরা নানারূপে ঘুরে

ফিরে বেড়াচ্ছে কিন্তু সাহিত্যে নতুন কিছু দান করবার ক্ষমতা আর এদের নেই। এদের ঘুরে বেড়ানোয় আমাদের কোনই আপত্তি নেই—আপত্তি ওঠে তখনই যখন এরা বিশুদ্ধ সাহিত্যের অজুহাত দেখিয়ে সমাজতন্ত্রী সাহিত্যকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। নিজেদের অকৃতিত্বকে চাপা দেবার জন্যই তারা সমাজতন্ত্রী সাহিত্যকে নীচু শ্রেণীর 'প্রপাগাণ্ডা' সাহিত্য বলে জাহির করে। নিছক 'প্রপাগাণ্ডা' যে সাহিত্য নয়—সে কথা আমরাও জানি ঃ 'প্রপাগাণ্ডা' মাত্রই যদি সাহিত্য হ'ত, তবে 'কম্যুনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো' এবং বড় বড় রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা সাহিত্যের আসরে সবচেয়ে উঁচু আসন দাবী করত। কিন্তু সাহিত্যিকের হাতে প্রকৃত শিল্পরূপ নিয়ে 'প্রপাগাণ্ডা' যদি পাঠকের মনে সাহিত্যিক আবেদন জানাতে সক্ষম হয়, তবে তাকে সাহিত্য বলতে বাধা কোথায়? একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি। বার্ণার্ড্ শ বলেছেন যে তিনি আর্ট ফর আর্টস্ সেক(Art for art's sake) নীতির জন্য একটী পংক্তিও লিখ্তে নারাজ ; তাঁর মত হল যে জীবনের জন্যই আর্টের প্রয়োজন। তাঁর রচিত প্রতিটী নাটকেই তিনি এই নীতি পালন ক'রে চলেছেন। তিনি যখন তাঁর গুরু ইবসেনের অনুসরণে ইংরেজী নাটককে অবাস্তব রোমান্সের রাজ্য থেকে টেনে নামালেন বাস্তবের রাজ্যে, তখন চতুর্দিক থেকে তুমুল প্রতিবাদ উঠ্‌ল। তাঁর সমস্যামূলক নাটকগুলি নাকি নেহাৎ 'প্রপাগাণ্ডা', তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি নাকি শুধু গ্রামোফোন্—সমসাময়িক জীবনের বিভিন্নসমস্যার তিক্ত সমালোচনা ক'রে তারা নাকি বার্ণার্ড্‌শরই জীবনাদর্শের প্রচার করে। এই সব অজুহাত দেখিয়ে অনেক সমসাময়িক নাট্য-সমালোচক তাঁর নাটক-গুলিকে সাহিত্যের পর্যায় থেকে নাকচ ক'রে দেবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বললেন যে মহাকালের দরবারে শ'র নাটক নাকি টিঁকবে না—কারণ তাঁর নাটক বিশুদ্ধ নয়—'প্রপাগাণ্ডা'-প্রধান। বার্ণার্ড্ শ' কিন্তু দম্‌বার লোক ছিলেন না ঃ তিনি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ধীর

পায়ে অগ্রসর হ'য়ে চল্‌লেন। অবশেষে তাঁর সাফল্য এল। তাঁর নাটকের দর্শকেরও যেমন অভাব হ'ল না পাঠকেরও তেমনি অভাব হ'ল না। সমাজের উপর তাঁর নাটকের এই প্রভাব বিস্তার দেখে গোঁড়া সমালোচকরা বিস্মিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তবে কি তাঁরা ভুল করেছিলেন? যাক্, অবশেষে তাঁরা নেহাৎ অনিচ্ছা সত্বেও শ'কে সাহিত্যিক ব'লে এবং তাঁর সৃষ্টিকে সাহিত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হ'লেন। তবু মনের সংশয় ঘুচ্‌ল না—'প্রপাগাণ্ডা'র দুর্ণাম শ'র ঘুচ্‌ল না। অবশেষে বার্ধক্যে তিনি যখন সম্মান ও যশের উচ্চশিখরে আরোহণ করেন তখন রক্ষণশীল নোবেল্ প্রাইজ সমিতিও তাঁকে নোবেল প্রাইজ্ দিলেন। আমাদের গোঁড়া সমালোচনা-পদ্ধতির এই হল নমুনা!

শিল্পীর অজ্ঞাতসারে হ'লেও শিল্পসৃষ্টির পিছনে শিল্পীর একটা উদ্দেশ্য থাকে। তা যদি না থাকৃত, তবে সাহিত্য কতগুলি কথার সমষ্টিতে পরিণত হ'ত মাত্র। যে সাহিত্যের মধ্যে এই উদ্দেশ্যটা প্রচ্ছন্ন, গোঁড়া সমালোচকরা তারই নাম দিয়েছেন বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য এবং যে সাহিত্যের মধ্যে এই উদ্দেশ্যটা একটু প্রকট, তারই নামকরণ হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। কিন্তু আমাদের বিচারে সব সাহিত্যই উদ্দেশ্যমূলক। প্রলাপ বকার জন্য বোধ হয় কেউ সাহিত্য সৃষ্টি করে না। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত ব'লেছেন: "প্রাণ ও শরীরের যা প্রয়োজনে লাগে, তাই যদি হয় কাজ, মনের এ সৃষ্টি অলৌকিক। সে প্রয়োজন মেটাবার যে চেষ্টা, তাই যদি হয় কাজ, মনের এ সৃষ্টি খেলা মাত্র। লীলা নাম দিলে হয়ত ভদ্র ও গভীর শোনায়, কিন্তু স্বরূপের বদল হয় না।" অতুলবাবুর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচক কোন্ যুক্তিতে যে এমন কথা বলেছেন, ভেবে পাই না। প্রাণ ও শরীরের প্রয়োজনে যেটা লাগে, সেটাকে তিনি বলছেন 'কাজ' কিন্তু মনের প্রয়োজনে যেটা লাগে, সেটাকে খেলা বলছেন তিনি কোন্ যুক্তিতে? সেটা কাজ নয় কেন? এটা যে শুধু কাজ,

তাই নয় ; দেহের প্রয়োজনের চেয়ে মনের প্রয়োজনটা কোন অংশে বোধহয় কম নয়। কোন প্রকৃত শিল্পীই বোধ হয় অতুলবাবুর সঙ্গে একমত হবে না। শুধু মনের খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি, এমন লঘু অর্থ সাহিত্যের করা চলে না কোন মতেই। অতুল-বাবুর কথাই যদি সত্য হয়, তবে মানুষের মনে যে সব অসঙ্গত, অসংলগ্ন এবং অসম্ভব ভাব ও চিন্তা থাকে তার সব কিছুই সাহিত্যে রূপ পায় না কেন? আর একজনের মনের খেলার কাহিনী শোনার জন্যও বোধ হয় সমাজের আর সকলের তেমন তীব্র ঔৎসুক্য নেই। সাহিত্যের এমনি বিকৃত লঘু অর্থ যাঁরা করতে পারেন তাঁরাই আর্টকে জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিবর্জিত বলে উল্লেখ করতে পারেন। আর্টকে জীবনের থেকে বিচ্যুত করার মানেই তার স্বয়ং-সম্পুর্ণ অস্তিত্বকে স্বীকার করা ঃ এই স্বয়ং-সম্পুর্ণ অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে আর্ট নির্জীব হয়ে পড়ে এবং তার অপমৃত্যু ঘটে। এ রকম স্বয়ং-সম্পূর্ণ অস্তিত্ব যাঁরা স্বীকার ক'রে নেন, তাঁদের যে বুদ্ধি-বৈক্লব্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। জড়বাদীর দৃষ্টিতে আর্ট হ'চ্ছে সামাজিক ক্রমবিবর্তনেরই একটা রূপ ঃ ধর্ম, রীতিনীতি, সাহিত্য এবং দর্শনে আমরা একই সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজে পাই।

বর্তমানে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, তার ফলে পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে। মানুষের ইতিহাসে এত বড় পরিবর্তন কোনদিন এসেছিল বলে আমাদের জানা নেই। এতদিন পর্যন্ত সমাজে যেসব পরিবর্তন চ'লে এসেছে, সেসব অনেক শান্তিপূর্ণ উপায়েই সাধিত হ'য়েছে। তার কারণ এই যে বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে মিলই ছিল বেশী। একটা উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রে পরিবর্তিত হতে একটা বিরাট বিপ্লবের প্রয়োজন হয় নি। এর প্রধান কারণ এই যে বহু ছোটখাটো বিষয়ে এই দুটি নীতিতে অসামঞ্জস্য

থাকলেও—এদের মূল নীতি অনেকটা একই রকমের। এই দুই নীতির লক্ষ্য সমাজকে শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে রাখা এবং শাসক সম্প্রদায় কর্তৃক অন্যান্য সম্প্রদায়ের শোষণ। কিন্তু ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রে বিরোধ এই মূলনীতির বিরোধ। ধনতন্ত্র চায় শ্রেণী স্বার্থকে কায়েমী করে রাখতে, সমাজতন্ত্র চায় শ্রেণীহীন সমাজ। এদের মধ্যে কোন প্রকার সন্ধি চলে না। তাই সমাজতান্ত্রিক আর্ট যে পূর্বগামী অন্যান্য সব আর্টের চেয়ে বিভিন্ন হবে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? অবশ্য সমাজতান্ত্রিক আর্ট্ আজ পর্যন্ত ভবিষ্যতের গর্ভেই আছে। সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা না হ'লে এ আর্টের প্রকৃষ্ট প্রস্ফুরণ সম্ভব নয়।

আধুনিক সাহিত্য-রীতির বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত আরেক স্থানে বলেছেন: "বর্তমান কালে ভাবী-সমাজের বিজয় দুন্দুভি বাজান, কি তার তালে পা ফেলে চলা যদি সকলের কর্তব্য হয়, তবে সেটা সামজিক কর্তব্য, সাহিত্যিক নয়।" শ্রীযুক্ত গুপ্ত যে-বিচারে সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রেছন 'মনের খেলা' ব'লে, ঠিক সেই বিচারেই সাহিত্যিক কর্তব্যকে সামাজিক কর্তব্য থেকে আলাদা ক'রে দেখতে পেরেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে সাহিত্যিক কর্তব্য সামাজিক কর্তব্যেরই অঙ্গীভূত—কেননা সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান র'য়েছে। দ্বিতীয়ত সব কবিই ভাবী সমাজের বিজয়-দুন্দুভি বাজান, এরকম নির্দেশ বোধহয় কোন আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকই দেন নি। এরকম নির্দেশ দেওয়া মুর্খতা ছাড়া কিছু নয়: কাব্যের বিষয়বস্তু কবিই বেছে নেন এবং তার নিজের শিল্পজ্ঞান অনুসারে তাকে কাব্যে রূপায়িত করেন। এরূপ ক্ষেত্রে আদেশ অনুরোধ কোন দিক থেকেই ফলপ্রসূ হয় না। মিস্টিসিজম্, সিম্বলিজম্ প্রভৃতি আজও সাহিত্যে অবাধ বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে—তবে তাদের এ বিচরণের দিন শেষ হ'য়ে এসেছে ব'লে মনে হয়। এ পথে আর নতুন সৃষ্টি সম্ভবপর নয়—তাই প্রাচীন-পন্থী সাহিত্যিক ও কবিরা

পুনরুক্তিতেই নিজেদের নিঃশেষিত ক'রে ফেলছেন। সমাজের যে প্রচলিত অবস্থায় তাঁদের অনুসৃত সাহিত্যরীতি পাঠক আকর্ষণ করতে পেরেছিল, আজ সমাজের সে অবস্থা নেই। তাই পাঠক-সমাজও নতুন কিছু চায়। জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিবর্জিত হ'য়ে শিল্প বেঁচে থাক্‌তে পারে না ঃ তাই আজকের দিনে মিস্টিসিজম্‌, সিম্বলিজম্‌ প্রভৃতি আর লোকের মনে ততটা প্রভাব বিস্তার কর্‌তে পারে না। প্রাচীন-পন্থী সমালোচকদের মত একদল প্রাচীন-পন্থী পাঠক যে আজও আছে সেকথা অস্বীকার করি না। তবে নতুন একদল পাঠকের সৃষ্টি হ'য়েছে যারা চর্বিত চর্বন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। এই নতুন মানুষের চাহিদার ফলে একটা নতুন সাহিত্য যদি জন্ম নেয়, তাতে গুপ্ত মহাশয়ের আপত্তির কি থাকতে পারে? শ্রেণীহীন একটা ভবিষ্যৎ সমাজ ববেস্থার যুক্তিসঙ্গত রূপ আজ পৃথিবীর অনেকের মনেই দেখা দিয়েছে। সে ভাবী সমাজের 'বিজয়-দুন্দুভি' কেউ যদি বাজায়, তবে দুঃখ করবার কি আছে? তবে আমাদের দেখতে হবে যে তার এই দুন্দুভি বাজানোয় কোথাও তাল কেটে গেল কিনা— এক কথায় তার রচিত সৃষ্টি সাহিত্য হচ্ছে কিনা। গোঁড়ামীর দুর্গে আশ্রয় নিয়ে, এ সাহিত্যকে উড়িয়ে দিলে চলবে না। দেখতে হবে এর পিছনে কোন সামাজিক ভিত্তি আছে কিনা এবং লেখক সাহিত্যে তার সত্যকার রূপ তীক্ষ্ণ অনুভূতির সাহায্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছেম কিনা। এ বিচারে অনেকটা উদার এবং সহনশীল না হ'লে লেখকের প্রতি অন্যায় অবিচার করা হবে। ভিক্টোরীয় যুগের রুচি-বিজ্ঞান দিয়ে ১৯৬২ সালের কাব্য-বিচার সম্ভবপর নয় কোন মতেই। এই ভাঙনধরা সমাজের মধ্যে থেকে যে-সব কবি—যেমন এলিয়ট, পাউণ্ড প্রভৃতি—তাঁদের নৈরাশ্যবাদী কবিতার খোরাক আহরণ ক'রেছেন, তাঁদের কাব্য-বিচারেই যখন সাবেক ঐতিহ্যের মাপকাঠি অচল, তখন ভবিষ্যৎ শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার আশা ও অনুভূতিতে রঙীন অতি আধুনিক কবিতার বিচারে এ মাপকাঠি যে কোন রকমেই যুক্তিসঙ্গত

নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বলিষ্ঠ ভবিষ্যতের স্বপ্নে মুখর এই কবিতাকে বিচার করতে হলে সাবেক রুচি-বিজ্ঞানে আরেকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত করতে হবে। তা নইলে বিচার হবে এক তরফা, সমস্যার সমাধান হবে না কিছুতেই।

প্রচীনপন্থী সমালোচকদের মত এইযে কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাব্য-প্রবাহ একই খাতে বয়ে এসেছে, তবে হঠাৎ কেন সে কাব্য-প্রবাহ মোড় ফিরবে? কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দু'হাজার বৎসরের ব্যবধান হলেও এ দুহাজার বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সমাজ জীবনে খুব বড় একটা আন্দোলন হয় নি কিছুই। হিন্দু-রাজার জায়গায় হয়ত মুসলমান বাদ্‌শাহ হয়েছে কিন্তু তার ফলে ধনোৎপাদন প্রণালীতে খুব বড় রকমের একটা বিপ্লব দেখা দেয় নি। এর পরে ব্রিটিশ ধনতন্ত্র এসে ভারতের বুকে বাসা বেঁধেছে। এই যে প্রাক-ব্রিটিশ সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্রের প্রসার লাভ—এর ফলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় খুব বড় এবটা আন্দোলন হয় নি: আমাদের সমাজের গোঁড়া ঐতিহ্যবোধই এর জন্য দায়ী। তবু বাইরের কতকগুলি নতুন ভাব এসে আমাদের সমাজ-প্রবৃত্তিতে আশ্রয় নিয়েছিল। এর ফলেই রবীন্দ্রনাথের মত কবির জন্ম সম্ভব হয়েছিল। কৃষিজীবী যুগের কবি কালিদাসের ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান আছে; সঙ্গে সঙ্গে ভিক্টোরীয় যুগের ধনতান্ত্রিক ভাবধারাও তাঁর কাব্যে সমভাবে ফুটে উঠেছে। এইখানেই রবীন্দ্র-নাথের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। কালিকাসের কাব্যরীতির প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথের উপর খুব বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই: ধনতন্ত্রের আওতায় বর্ধিত আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবও তাঁর উপর কম নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দুই ভাবধারাকে রবীন্দ্রনাথ সমভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল অতীতাশ্রয়ী: কালিদাসের সময়ে জন্মালে যেন কবির মনোবাসনা পূর্ণ হ'ত। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও

সংস্কৃতির ক্রোড়ে তিনি যেন শান্তি খুঁজে পেতেন না। তাই এই নাগরিক সভ্যতার বৈষম্য তাঁকে প্রপীড়িত করে তুলত—তিনি স্বসৃষ্ট কল্পনা-জগতের সাহায্যে এই বৈষম্যের সমাধানের চেষ্টা করতেন। তাই আমরা যখন তাঁর কাব্যে পড়ি ঃ

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর'

কিংবা 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস'

তখন আমরা সানন্দে কবির কাব্যের চমৎকারিত্ব স্বীকার ক'রে নেই বটে কিন্তু কবির সমাধানে আমাদের বুদ্ধি সাড়া দেয় না। আধুনিক সভ্যতার যত বৈষম্যই থাক্—এই সভ্যতাকে ছেড়ে আমাদের চল্‌বে না। আজকের দিনে আরণ্যক সভ্যতা তার সহজ সারল্য নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাস চিরদিন এগিয়েই চলেছে। যতই ভাঙা গড়া চলুক তার অগ্রগতি রুদ্ধ হবার নয়। এই অগ্রগামী ঐতিহাসিক চক্রের গতি যদি পিছনমুখী ক'রে দেয়া সম্ভব হত, তবে কবির প্রদর্শিত সমাধান সফল হত। কিন্তু তা হবার নয় ঃ এই নাগরিক সভ্যতা, এই ইট, কাঠ, লোহা লক্কড় নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। এদের বুক থেকেই খুঁজে বার করতে হবে নতুন কবিতার উপাদান। আমাদের মনে রাখতে হবে যে যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর কোন বিরোধ নেই। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যন্ত্রই হচ্ছে আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অবলম্বন। আজকের নগরের এই রূপ হয়ত ক্ষণভঙ্গুর ঃ কিন্তু এ নগর ভেঙে আবার পল্লী-সভ্যতার প্রবর্তন সম্ভব নয়। অপর পক্ষে বর্তমানের গ্রামিক সভ্যতাই নাগরিক সভ্যতার পর্যায়ে উঠে আসবে। অনেকে বল্‌তে পারেন যে এই যদি ভবিষ্যতের রূপ হয়, তবে আজকার যন্ত্রযুগের সভ্যতার চাপে পড়ে মানুষ এ রকম হাঁপিয়ে উঠেছে কেন? এই সভ্যতাকে নিয়ে ভবিষ্যতে সে কি ক'রে বাঁচবে? তার উত্তরে বলা যায় যে আজকের এই বৈষম্যের এবং বিরোধের জন্য যন্ত্র দায়ী নয় ঃ দায়ী তারাই যারা যন্ত্রের মালিক। আধুনিক ধনোৎপাদন প্রণালীকে যাঁরা নিয়ন্ত্রিত

করছেন, সেই ধনতন্ত্রের বড় কর্তারাই আজকের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতায় এই যন্ত্রই মানুষের জীবনে পরম সুখের কারণ হবে। ব্যক্তিগত ভাবে নয়, সমষ্টিগত ভাবে মানুষের জীবন আবার সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। ধনোৎপাদন প্রণালী এবং ধনবণ্টন প্রণালী বদ্‌লে যাবার ফলে মানুষে মানুষে আবার সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হবে; এক কথায় শ্রেণীহীন সমাজের গোড়া পত্তন হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ধনতন্ত্রের শক্তি আন্তর্জাতিক, দেশে দেশে নিজেকে ছড়িয়ে না দিয়ে তার পক্ষে বাঁচার উপায় নেই। সামন্ততান্ত্রিকতার মত একটি বিশেষ দেশে আবদ্ধ হয়ে সে থাকতে পারে না। ধনতন্ত্রের শক্তি যেমন আন্তর্জাতিক, তার বিরোধী মতবাদ সমাজতন্ত্রের শক্তিও তেমনি আন্তর্জাতিক। আমাদের দেশে ধনতন্ত্র যখন আসন গেড়েছে, তখন তার বিরোধী সমাজতন্ত্রও যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? সারা পৃথিবীতে আজ এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির লড়াই চলছে। ফলে বাংলা সাহিত্যেও সমাজতন্ত্রের ঢেউ লেগেছে। বাংলাদেশের অনেক তরুণ সাহিত্যিক যাঁরা এই নতুন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ, তাঁদের মন যদি এই নতুন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার ডাকে সাড়া দেয়, তাতে দোষের কি থাক্‌তে পারে? যে নতুন সমাজের রঙে আধুনিক চিন্তা ও অনুভূতি রঙীন তার একটা বলিষ্ঠ রূপ যদি আমাদের সাহিত্যে ফুটে ওঠে, তবে আমাদের সাহিত্যের পক্ষে সেটাতে অগৌরবের চেয়ে গৌরবই হয়ত বেশী হবে।

অনেক হয়ত বল্‌বেন যে এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার জন্য যে আকুল কামনা এটাও এক ধরণের রোমান্টিসিজ্‌ম্। অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা, অ-পাওয়াকে পাবার আকাঙ্ক্ষা যদি রোমান্টিসিজম্ হয় তবে এটা রোমান্টিসিজম্ বই কি? তবে এ রোমান্টিসিজম্ অবৈজ্ঞানিক নয়ঃ যুক্তি-সম্মত বিজ্ঞানের উপরই এর ভিত্তি। এর মধ্যে আবেগের চেয়ে বুদ্ধির প্রেরণা কম নয়। শেলীর রোমান্টিসিজম্ যেমন নিছক

আত্ম-কেন্দ্রিক, এ নতুন রোমান্টিসিজম্ সেরূপ নয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য সমষ্টিগত অনুভূতিতে। শেলীর মত আদর্শবাদী কবি পদে পদে বাস্তব জগতে যখন নিজের আদর্শকে ব্যাহত হতে দেখেন তখন তিনি রোমান্টিক হয়ে পড়েন ঃ বাস্তব জগতের সঙ্গে আদর্শ জগতের মিল হয় না বলেই তাঁদের এ রোমান্টিসিজম্। শেলীর কবিতা পড়ে বোঝার উপায় নেই তিনি কি চান ঃ তাঁর আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অস্পষ্ট। কিন্তু আধুনিক বস্তুতন্ত্রবাদী কবির আকাঙ্ক্ষা অস্পষ্ট নয়—তিনি কখনও আদর্শ জগতের স্বপ্ন দেখেন না। আধুনিক কবি জানেন যে আদর্শের সঙ্গে কখনও বাস্তবের মিল হবে না। আদর্শ চিরকালই আদর্শ থেকে যাবে। যে শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখেন, সেটা বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত, এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির থেকেই তার জন্ম হবে ঃ এমন কি সোভিয়েট সংস্কৃতি ও সভ্যতায় তার গোড়াপত্তনও দেখা গেছে। এইখানেই পূর্বগামী রোমান্টিসিজ্‌মের সঙ্গে আধুনিক রোমান্টিসিজ্‌মের তফাৎ।

ভবিষ্যতের সাহিত্যের প্রাণ হবে সমষ্টিগত একতা—জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হবে—ফলে সাহিত্যের প্রাণশক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাবে, মৈত্রী, সম্প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি মানব হৃদয়ের যে সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আজকের বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার চাপে প'ড়ে হাঁস ফাঁস ক'রছে এবং কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা প'ড়েছে, তারা মুক্তি পাবে—ভবিষ্যৎ সাহিত্য ঝংকৃত হবে এদেরই বলিষ্ঠ অনুসরণে। অনেকের ধারণা আছে যে ভবিষ্যতের সমাজতন্ত্রী সাহিত্য বুঝি শুধু ইট, কাঠ, লোহা লক্কড়ের জয়গানেই মুখর হ'য়ে উঠ্‌বে—কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং আজকের দিনে যে-সব স্বাভাবিক মানবীয় মনোবৃত্তি নানারূপ বিধি-নিষেধের চাপে পড়ে সাহিত্যে প্রকাশ লাভ কর্‌তে পারে না, তারা সমাজতন্ত্রী সাহিত্যে অবাধে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পাবে ; সমাজতন্ত্রী সাহিত্যে নরনারীর প্রেমে ভগবদ্‌ভক্তির প্রলেপ বুলানোর প্রয়োজন হবে না। নর এবং নারীর

সম্পর্ক সহজ স্বাভাবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের বলিষ্ঠ প্রেমে আজকের দিনের দুর্বলতা ও কৃত্রিমতা থাক্‌বে না। ভবিষ্যতের সাহিত্যের ভিত্তি হবে বলিষ্ঠ বাস্তব জগত—তার পিছনে থাক্‌বে সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি : ঈশ্বরের কোন স্থানই থাক্‌বে না সেখানে। আজকের দিনে অনেকেই বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় মত্ত থাকেন : তাঁদের সাহিত্যে বিশ্বতত্ত্বের অনেক নতুন তথ্যই আমরা শুন্‌তে পাই। বিশ্বতত্ত্ব জিনিষটা খুবই ভাল, কিন্তু আমাদের এই জড় জগতে এমন অনেক জিনিস আছে আজও যা' সাহিত্যে রূপ পায় নি। সাহিত্যে তাদের রূপ দেওয়া কি সাহিত্যিকের কর্তব্য নয়? বিশ্বতাত্ত্বিক অনেক সময় বিশ্বতত্ত্বের খোঁজ কর্‌তে গিয়ে মাটির জগতের কথা ভুলেই যান : তাঁর মন ঘুরে ফেরে তারকার রাজ্যে। এই বিশ্বতত্ত্বের সমাধান পরে হ'লেও ক্ষতি নেই : মানুষের জড় জগতের সমস্যা আশু সমাধান কামনা করে। বিশ্বতত্ত্ব খুবই ভাল জিনিস। কিন্তু আমাদের প্রথম কর্তব্য হ'চ্ছে মানুষের ইতিহাস জানা—যে ঐতিহাসিক যুগে আমরা বাস কর্‌ছি তার খুঁটিনাটি জানা। মানুষের অতীত জীবন, বর্তমান জীবন, তার কাজ, মুক্তির জন্য তার আন্দোলন, তার আশা-আকাঙ্খা, তার পরাজয় এবং তার বিজয়—এ সবই আমাদের প্রথম জানা দরকার। মানুষের এই ইতিহাসকে যাঁরা সাহিত্যে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন, তাঁদের সাহিত্যকে গোঁড়া সাহিত্যিকরা যদি 'বিশুদ্ধতা'র নজির দেখিয়ে নাকচ ক'রেও দেন—তবু ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা জানি সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে : আজ মানব জীবনে যে-সব সমস্যা এসে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে, তারা যদি শিল্পীর চেতনায় সাহিত্যে রূপান্তরিত হ'তে পারে, তবে প্রাচীন-পন্থী সমালোচকেরা তার বলিষ্ঠ গতিকে রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। এর জন্য আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী চাই—চাই বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে নতুন অনুভূতি—চাই মানব-ইতিহাসের সঙ্গে সচেষ্ট প্রত্যক্ষ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য-

সৃষ্টির পিছনে যদি আন্তরিক একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাঁদের সাহিত্য পূর্বগামী সাহিত্য থেকে ভিন্ন হলেও, সাহিত্য যে হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

॥ সাহিত্য ও রাজনীতি ॥

আজকের দিনে সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে দেশে ও বিদেশে যুক্তি-তর্কের অন্ত নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী যে বিরাট পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে—সেই সঙ্কট মুহূর্তে এ জাতীয় পরস্পর-বিরোধী যুক্তি-তর্ক অবশ্য অন্যায় নয়। তবু একটা কথা থেকে যায়। পৃথিবীতে রাজনীতি তো সদ্যোজাত নয়। রাজনীতি যদি সদ্যোজাত হত, তবে তার সঙ্গে বহু পুরাতন এই সাহিত্যের একটা স্পষ্ট মতবিরোধের কারণ পাওয়া যেত। একথাটা অবশ্য আংশিক সত্য। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, মানুষ সভ্য হয়ে রাষ্ট্র-জীবন গড়ে তোলার পর থেকেই তার একটা স্বতন্ত্র রাজনীতি জন্ম নিলেও, সমাজ-জীবনে তার প্রভাব আজকের মত ব্যাপক ও গভীরভাবে কোন দিনই দেখা দেয়নি। রাজনীতি কথাটিও আবার দুটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। একটি অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ ঃ যে অর্থে আমরা মন্ত্রীত্বের অদল-বদল কিংবা দৈনন্দিন রাজনৈতিক দলাদলিকে রাজনীতি আখ্যা দিয়ে থাকি। অপর বৃহত্তর অর্থে রাজনীতি এবং সমাজ-জীবন প্রায় সমার্থবোধক—রাজনীতি সেখানে সমাজ-জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। শেষোক্ত অর্থে সমাজকে কোন ক্রমেই রাজনীতির হাত থেকে বিমুক্ত করা চলে না। মন্ত্রীত্বের অদল-বদল সংবাদপত্রের পক্ষে যত বড় সংবাদই হোক কিংবা সাময়িক ভাবে জনসাধারণের পক্ষে যতই কল্যাণপ্রদ বা অশুভ হোক, কোন সাহিত্যিককে সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকে তা' বিশেষ নাড়া দেয় না—তার কারণ এ বিষয়টির স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য গৌণ। রাজনীতির যে দ্বিতীয় সংজ্ঞা নির্দেশ করেছি, সে বিচারে দেখতে গেলে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রতিভাবান্

সাহিত্যিক ও শিল্পীই ছিলেন রাজনীতি সচেতন। একথা যাঁরা অস্বীকার করতে চাইবেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের জীবন-দর্শনকেই করবেন অস্বীকার। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় এক শ্রেণীর "বিশুদ্ধ" রসশিল্পী নামধারী সাহিত্যিকের অভাব নেই। এঁরা জীবনধর্মী সাহিত্যের গতিশীলতা সরাসরি অস্বীকার না করলেও, প্রমাণ করতে চান যে, তাঁদের পরিকল্পিত একটা কাল্পনিক মনোজগতের বাঁধা ছকেই সাহিত্যের যা কিছু আবর্তন হয়। সেই গতিচক্র থেকে একটু বিপথগামী হলেই নাকি এঁদের মতে বিশুদ্ধ রস সাহিত্যের হয় অপমৃত্যু।

সাহিত্যের এই বিশুদ্ধতার স্বরূপ একটু তলিয়ে দেখলেই এঁদের ভুল অতি সহজে চোখে পড়ে। এককালে সাহিত্যে যখন বাস্তববাদের সঙ্গে আদর্শবাদের প্রবল সংঘর্ষ চলেছিল, তখনও আদর্শবাদী সাহিত্যিকদের এই বিশুদ্ধতার দোহাই-এর আড়ালে আশ্রয় নিতে দেখা যেত। মানুষের সাহিত্য ও শিল্প বরাবর একটা স্বপ্ন-জগৎ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়ে এসেছে বটে, কিন্তু সে স্বপ্নজগৎ নিদ্রিতাবস্থায় দেখা স্বপ্নের মত অলীক বা অবাস্তব নয়। তার দৃঢ় ভিত্তি থাকে এই মাটিরই পৃথিবীতে এবং তা এই মাটির পৃথিবীর মানুষদের জন্যই রচিত হয়। তাই মানুষ বা জীবনকে বাদ দিয়ে শুধু নিরালম্ব কল্পনার ভিত্তিতে রচিত কোন সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছে—এ দৃশ্য বিরল। মানুষের জন্য রচিত এই সাহিত্যে সৌন্দর্য তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বা তারই অপরিহার্য শর্তরূপে থাকে একটা জনকল্যাণ বা সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক। সাহিত্যের এই সামাজিক দিকটাকে অস্বীকার করে যাঁরা যুক্তিহীন ও উদ্দেশ্যহীন 'আর্ট ফর আর্টস্‌সেক' নীতির অবতারণা ক'রে আত্মবঞ্চনা করেন এবং নিজেদের সমাজবিমুখী ব্যর্থ বুদ্ধিবাদ বা কল্পনা-বিলাসের গিরিদুর্গে আটকে রেখে ভাবেন যে, তাঁরা সমাজের সকল মানুষের উর্ধ্বে, তাঁরাই শুধু বিশুদ্ধতার দোহাই পেড়ে সাহিত্যে রাজনীতির

প্রবেশে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু আতঙ্কিত হলে কি হবে? সাহিত্য বিবর্তনের সুনির্দিষ্ট গতিপথে বাধা সৃষ্টি করবার মত শক্তি তাঁদের কোথায়? এ বিবর্তন রোধ করতে হলে সমাজকেই করে দিতে হবে ভিন্নমুখী—তা না হলে সাহিত্যের সমাজধর্মী বিবর্তনে আদৌ কোন রদবদল হবে না। এ বৈজ্ঞানিক গতি বিবর্তনের প্রকৃত স্বরূপ না বুঝে যাঁরা এর বিরোধিতা করবেন—তাঁরাই যাবেন ভেসে। হচ্ছেও তাই। আমাদের সাহিত্যে বর্তমানে নবীন ও প্রবীণদের যে আদর্শ সংঘাত হচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন নবীনরাই। ধ্বংসশীল প্রবীণদের দলে লেগেছে ভাঙন—আর সমাজ-সচেতন নতুন লেখকদের দলের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। অথচ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় জনসমাজে মতবাদ প্রচারের সুবিধা সংস্কারধর্মী প্রবীণদের যত বেশী, বিপ্লবী নবীনদের তার শতাংশের একাংশও নেই! তবু এ পরিণিত কেন? দেয়ালে এ সুস্পষ্ট লেখন দেখেও কি আজকের দিনে প্রবীণদের চৈতন্যোদয় হবে না?

সাহিত্যে সমাজ সচেতনতা কথাটা আজকাল প্রতিনিয়তই শোনা যায়। অথচ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ কথাটা নতুন আবিষ্কার হলেও, এর অস্তিত্ব সমাজ ও সাহিত্যের সম-সাময়িক। সাহিত্য বিচারে মিথ্যা আদর্শবাদ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বলেই আমরা সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কারের প্রয়াস পাইনি। বাইবেলে আছে যে বিশ্বসৃষ্টির গোড়ায় ঈশ্বর ভাগে ভাগে জীব-জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন—যেমন মানুষ, পশু, পাখী, কীট পতঙ্গাদি। প্রকৃত বিজ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ধর্মশাস্ত্রের এই ভূল-সৃষ্টিতত্ব মিথ্যা প্রমাণিত করতে মানুষের কমপক্ষে দু'হাজার বৎসর লেগেছে। জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারুইনের আবির্ভাবের পূর্বে এই খৃস্টিয় সৃষ্টি-তত্বকে কেউ প্রকৃত চ্যালেঞ্জ করে নি। ডারুইন ও তৎপরবর্তী জীব-বিজ্ঞানীদের অমোঘ যুক্তি তর্ক সত্বেও পৃথিবী থেকে বাইবেলের অবিশ্বাস্য সৃষ্টিতত্বে বিশ্বাস সমূলে উৎপাটিত হয় নি। এখনও অনেক

ধর্মভীরু খৃস্টান বাইবেলের প্রতিটি কথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মেও এই জাতীয় শাস্ত্রবিশ্বাস বহুল পরিমাণে প্রচলিত। বিজ্ঞানের সঙ্গে শাস্ত্রের যেখানে সংঘাত লেগেছে, সেখানে ধর্মভীরু শাস্ত্রবিদ্‌রা নতুন নতুন আধা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আবিষ্কার করে অবাস্তব শাস্ত্রীয় সত্যকে টিঁকিয়ে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে খাঁটি ধর্মীয় সত্যের মিল অসম্ভব হলেও ধনতান্ত্রিক জগতে এডিংটনের মত খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদ্‌কেও সে চেষ্টা করতে দেখা যায়। জীবনে নিছক সংস্কারের প্রভাব যে কত বড়—এ তারই প্রকৃত প্রমাণ। সাহিত্যের ক্ষেত্রও এ সংস্কারের হাত থেকে মুক্ত নয়। সার্থক সাহিত্য কোন দিনই সমাজবিচ্যুত ছিল না, ভবিষ্যতেও কোন দিন সমাজবিচ্যুত সাহিত্য সৃষ্টি হবে না। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত সাহিত্যকে সমাজের থেকে বিচ্যুত করে দেখাই যেন একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ সে রেওয়াজ অনেকটা কেটে গেলেও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সেই সংস্কারের রেশ আজও রয়ে গেছে। যাঁদের মধ্যে আছে তাঁরা অতিমাত্রায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাদী। তাঁরা ভাবেন যে সাহিত্যের সৃষ্টি-কর্তা যে ব্যক্তি, সে ব্যক্তি সমাজ-সীমার বাইরে—নিজের সৃষ্টির গিরিদুর্গে তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রোজ্জ্বল ও ভাস্বর। সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে, এমন কি সমাজকে উপেক্ষা করেও এঁদের মতে সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব। সংস্কার-বাদীদের সঙ্গে যুক্তিবাদীদের মত-বৈষম্য এইখানে। সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির জটিল সম্পর্কের মূল কেন্দ্রও এইখানে। বিগত যুগের সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে, আধুনিক যুগের সাহিত্য সমালোচনার তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই মতবিরোধ স্পষ্ট ধরা পড়ে। দেশে এবং বিদেশে সাহিত্য-সমালোচকেরা সেদিন পর্যন্ত সাহিত্য বিচারে সাহিত্যস্রষ্টার উপর যতটা জোর দিতেন তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর ততটা জোর দিতেন না। সামাজিক দৃষ্টি-কোণ থেকে সাহিত্যের বিচার অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে ব্যক্তি-সত্তা একটা বড় জিনিষ—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ব্যক্তি-সত্তা নিয়ন্ত্রিত হয় পারিপার্শ্বিক সমাজ-ব্যবস্থার দ্বারাই। এই পারিপার্শ্বিক সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই ব্যক্তি-সত্তা পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং সাহিত্য বিচারে সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা চলে কি ভাবে? অস্বীকার করতে গেলে সাহিত্যের অনেক কিছুই দুর্বোধ্য থেকে যাবে। এলিজাবেথের যুগের সমাজ-জীবনের একটা মোটামুটি পরিচয় না জানলে, সেকস্‌পীয়ারের সাহিত্য পুরোপুরি বোঝা যাবে না। সেকস্‌পীয়ার যদি এলিজাবেথীয় যুগে না জন্মে ভিক্‌টোরীয় যুগে জন্মাতেন, তবে তাঁর হাত দিয়ে 'ম্যাকবেথ' কিংবা 'লীয়ারে'র মত নাটক বেরুতো না। তাঁর হাতে অনুরূপ বড় নাট্য-সৃষ্টিই হয়ত সম্ভব হত, কিন্তু সে নাট্য-সৃষ্টির কলা-কৌশল ও জীবন-দর্শন হত ভিন্ন। সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা ও তজ্জনিত জীবনদর্শনের সঙ্গে সাহিত্য-স্রষ্টার যে একটা মৌল যোগসূত্র রয়ে গেছে, এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। সাহিত্যিকের নিজস্ব ব্যক্তি-সত্তা সামাজিক সত্তার বাইরে নয়।

সমাজবদ্ধ মানুষ সভ্যতার একটা সুনির্দিষ্ট স্তরে উঠে যখন সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতি সৃষ্টিতে হাত দিয়েছিল, তখন সে পরিপূর্ণ সমাজ-সচেতনতা নিয়েই হাত দিয়েছিল। তার কারণ সাহিত্য তখন ছিল তার কাছে একটা সামাজিক কর্ম। তারপর দুনিয়ার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থাও বদলে গেছে—আর সেই সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পের ধারাও গেছে বদলে। শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার স্থানে দেখা দিয়েছে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। সর্বসাধারণের জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সে সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ ও ভাবধারার পরিপোষক। আমাদের জানা মানুষের দু'হাজার বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাস যদি আমরা অনুধাবন করি, তবে দেখতে পাব যে সাহিত্যিক যেখানে

শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠে সমাজ-জীবনের মধ্যে নিজের সত্তাকে সমাহিত করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেইখানেই আমরা তাঁকে মহান্ স্রষ্টা বলে অভিনন্দিত করেছি এবং তাঁর সাহিত্য মানুষের ইতিহাসে যুগ-নির্ধারক এক একটা স্তম্ভ বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জীবন-দর্শনের এই সুদৃঢ় ভিত্তি ও মানবতা-বাদ যাঁর সাহিত্যে যত বেশী, তিনি তত বড় সাহিত্যিক। মানুষের জীবনে যখন যে সত্য বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সাহিত্যেও তার সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে। মানবেতিহাসের প্রথম যুগের সাহিত্যে তাই ধর্মের প্রেরণা এত প্রবল। আধুনিক বিজ্ঞান-বুদ্ধির কাছে ধর্মের মূল্য যতই কম হোক আদি ও মধ্যযুগে সমাজ-জীবন এই ধর্ম-বিশ্বাস দিয়ে ছিল আষ্টে-পৃষ্ঠে মোড়া। এই ধর্ম-বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই সে যুগের সাহিত্য সাধকরা সাহিত্য চর্চা করতেন। তাই সে যুগের সাহিত্যে ধর্মীয় ন্যায় অন্যায় বোধের এত প্রাবল্য—মায়াময় ইহজগতের শেষে স্থায়ী সুখ ও শান্তির আগার পরলোক প্রাপ্তির সুবিপুল সম্ভাবনা। আমার এ-উক্তি কোন বিশেষ জাতির সাহিত্য ঘটিত নয়—সকল জাতির সাহিত্য প্রারম্ভিক অবস্থায় এই পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। পৃথিবীর সর্বত্র এই একই পথে মানব-সমাজের বিবর্তন হয়ে এসেছে বলে, সাহিত্যও এই একই পথগামী।

সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের অবসানেই আমরা দেখি আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের অভ্যুত্থান এবং তজ্জনিত যন্ত্র-যুগের প্রসার। সামন্ত-তন্ত্রের বিরোধিতা করে পৃথিবাতে নবযুগের প্রবর্তনের দুরাশায় সেদিন ধনতন্ত্রবাদীরাই নিজেদের প্রয়োজনে ধর্মের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারে সহায়তা করেছিল। সেদিন না :বুঝলেও আজ তারা বুঝতে সুরু করেছে যে, এরই মধ্যে উপ্ত ছিল তাদের মৃত্যু-বীজ। যাক সে পরের কথা। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ ফল হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রসার। সমাজের বৃহত্তর সত্তার মধ্যে নিজের ব্যক্তি-সত্তার সুষ্ঠু সমন্বয়ের দ্বারাই যে প্রকৃত

মুক্তি পাওয়া যায় মানুষ একথা গেলো ভুলে। এর একটি কারণ অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আবশ্যিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। এ সমাজ-ব্যবস্থা একই মুখে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের পরস্পর-বিরুদ্ধ বুলি আওড়ায়। এই অবস্থায় পড়ে সাহিত্যিক সমাজের সঙ্গে তার যোগসূত্র যেন অনেকটা হারিয়ে বসেছে। গত একশ' বৎসর ধরে সাহিত্যে এই অবস্থাই চলে আসছে। তবু এরই মধ্যে যাঁরা প্রকৃত বড় সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন, দেখা যায় যে, তাঁরা বহু-ঘোষিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আড়ালে আত্মগোপন করার প্রয়াস পেলেও, সমাজ-জীবনে নতুন ভাবধারার সংঘাত থেকে মুক্তি পাননি। সমাজ-জীবনের ভাবধারা এবং উত্থান পতনের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখে সাহিত্য-রচনা যদি অপরাধ হয়, তবে বিশ্বের সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই অপরাধী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবন থেকে ধর্মের প্রভাব যত কমে যাচ্ছে অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রভাব যাচ্ছে তত বেড়ে। সুতবাং আজকের দিনে জীবনাদর্শ হিসাবে ধর্মের স্থানে রাজনীতিকে স্থান না দিয়ে উপায় কোথায়? দেড়শো বৎসর পূর্বে ওয়ার্ডসৃওয়ার্থ ও কোলরিজ ইংরেজী কবিতায় ক্লাসিসিজমের পরিবর্তে যে রোমান্টিসিজমের গোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন, তার মূলে কি এই রাজনৈতিক প্রেরণা অন্যতম কারণ ছিল না? এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসৃওয়ার্থের সঙ্গে ফরাসী বিদ্রোহের সম্পর্ক স্মরণযোগ্য। এর পরে এলেন শেলী, কীট্‌স, বায়রণ। এঁদের কাব্য সাহিত্যের উপরও সমসাময়িক রাজনীতির প্রভাব অসম্ভব। শেলীর "Revolt of Islam", "Prometheus Unbound" কিংবা "Queen Mab" কি স্পষ্ট উদ্দেশ্যবাদী কাব্য নয়? মার্ক্স বলতেন যে, চার্টিস্ট নামক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন শেলী তাঁর কাব্যের মারফৎ। "Qeen Mab" নামক কাব্যগ্রন্থটি একসময় চার্টিস্টদের বাইবেল নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এমনইভাবে আমরা যদি ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ে সাহিত্যের বিচার করে দেখি, তবে দেখতে পাব

যে যুগের সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে সব ক্ষেত্রেই সাহিত্যিকদের সঙ্ঘর্ষ হয়। সাহিত্যিক যেখানে সমাজমুখী হন, সেখানে তিনি সজীব সচল সমাজ জীবনকেই করেন তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য এবং তার ফলে সাহিত্য হয় জীবন্ত। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তার আবেদন হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। তা' নইলে সাহিত্যিক এই সমাজজীবনকে উপেক্ষা করে হয়ে ওঠেন পলায়নবাদী—নিজের বুদ্ধি কল্পনার গিরিদুর্গে আত্মকেন্দ্রিতার ফলে তিনি হয়ে ওঠেন সমাজ-বিমুখী। এই সমাজবিমুখ সাহিত্যিকরাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে রাজনীতিকে সাহিত্যের বহির্ভূত বলে করেন প্রচার। তাঁদের মতে লেখক যেন সামাজিক জীব নন কিংবা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিও যেন সামাজিক কর্ম নয়।

যে প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদ এতকাল ধরে মানুষের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার মূল কাজ ছিল আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম বা দর্শনের মধ্যে যে একটা আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র রয়ে গেছে, তা' কোন দিনই আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়নি। সমাজ-জীবনের যুগসঞ্চিত সম্মিলিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে যদি পারস্পরিক যোগ-সূত্র না থাকে, তবে সে জ্ঞানের অর্থ কি? এককথায় সাহিত্য বা শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গেলে বলতে হয় যে, ভাষা বা রেখার মাধ্যমিকে সুসমাহিত ব্যক্তি-সত্তার বহিঃপ্রকাশ। সংজ্ঞাটিকে যত সরল মনে হয়, আসলে ব্যাপারটা তত সরল নয়। কেননা সত্তা বস্তুটিই যে সরল নয়—এ বস্তুটি অত্যন্ত জটিল। সামাজিক বহুবিধ সংস্কার এবং তার সঙ্গে মানুষের আবিষ্কৃত বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের আহরিত সত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এই ব্যক্তি-সত্তা। সমাজের সঙ্গেও থাকে তার একটা গভীর নাড়ীর যোগ। এই একীভূত সত্তা যে সাহিত্যে যত গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সে সাহিত্য হয় তত বেশী জীবন্ত ও শ্রেষ্ঠ। এই একীভূত মানব-সত্তারই

বহিঃপ্রকাশ আমরা পাই উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মারফৎ সত্যকে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টায়—আবার এই সত্তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় কবিতায়—স্বীয় অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সত্যানুসন্ধানে। এই ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে বৃহত্তর মানব-সমাজের আন্তরিক যোগ আছে বলেই জনগণ কবিতা বা উপন্যাস পড়ে বোঝে। এই বিচারের আলোকে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তি-সত্তার দিকে তাকালেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। কিন্তু তিনি কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন বলে কি তাঁর মধ্যে শুধু পূর্বগামী সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্য এসেই মিলিত হয়েছিল? শুধু এই জ্ঞান দিয়েই কি তাঁর বিরাট ও ব্যাপক ব্যক্তি-সত্তার বিচার করা চলে? কিংবা যদি বলি যে, ঊনবিংশ শতকের আদর্শবাদী ভাবধারার মধ্যে ছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যের উৎস—তা হলেই কি রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি সুবিচার করা হয়? তা হয় না—তার কারণ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সত্তা ছিল আরও ব্যাপক—আরও জটিল। বিশ্বের সঞ্চিত সকল জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধু আহরণ করে রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সত্তার মধুচক্র। দর্শন, ইতিহাস, জীব-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, রাজনীতি—কিছুই তাঁর মধ্য থেকে বাদ যায়নি—সবই তাঁর চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। এইসব কিছুর সুষ্ঠু সমন্বয়ে একীভূত যে সত্তা—তাকেই আমরা বলতে পারি রবীন্দ্র-সত্তা। এই শিল্প-সত্তার অধিকারী যে রবীন্দ্রনাথ, তিনি দার্শনিক নন, ঐতিহাসিক নন, বিজ্ঞানবিদ নন, রাজনীতিবিদও নন—তিনি কবি, তিনি শিল্পী। তাঁর এই জটিল ব্যক্তি-সত্তার বহিঃপ্রকাশরূপী সাহিত্য যে আমরা বুঝতে পারি তার কারণ আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি-সত্তাই কম বেশী পরিমাণে জটিল। শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতির তারতম্য অনুসারেই ব্যক্তি-সত্তার জটিলতার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। সমাজের সঞ্চিত জ্ঞান ছিল বলেই রবীন্দ্র-সত্তার উদ্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়ারের যুগে জন্ম নিলে তিনি আজকের রবীন্দ্রনাথ

হতেন না—তাঁর বিরাটত্ব অক্ষুন্ন থাকলেও সে বিরাটত্বের স্বরূপ হ'ত অন্য। বৃহত্তর সামাজিক সত্তার মধ্যেই যে তাঁর ব্যক্তি-সত্তার সার্থকতা, রবীন্দ্রনাথ এ সত্য জানতেন এবং জানতেন বলেই সমাজ-মুখী রবীন্দ্র-সাহিত্য সামাজিক ভাবধারার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একাধিকবার বিবর্তিত হয়েছে। 'মানসীর' কবি, রবীন্দ্রনাথ আর 'পুনশ্চ'-র কবি রবীন্দ্রনাথ এক হয়েও তাই এক নন। কাব্য বা সাহিত্যের এই সমাজ ব্যবস্থানুযায়ী বিবর্তন যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে আজকের সাহিত্য থেকে রাজনৈতিক ভাবধারার প্রাবল্য ছেঁটে বাদ দেওয়া যায় কি ভাবে?

ভ্রান্ত মতবাদের ফলে মানুষকে আমরা দ্বিখণ্ডিত বা বহুবিভক্ত সত্তার অধিকারী বলে মনে করি বলেই সাহিত্যবিষয়ক বিভ্রান্তিকর মতবাদের সৃষ্টি হয়। এর পরিপোষকরূপে আদর্শবাদী জীবন-দর্শন আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করেই শুধু ক্ষান্ত হয় নি—আমাদের ব্যক্তিসত্তাকেও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছে! এই জীবন-দর্শন যে কত ভ্রান্ত তা সর্বপ্রথম প্রমাণিত করেছেন কার্ল মার্ক্স তাঁর দ্বান্দ্বিক জড়বাদের প্রবর্তন করে। তিনি প্রমাণিত করেছেন সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির অখণ্ড সত্তা—আপাতদৃষ্টিতে যা বিচ্ছিন্ন, তা শেষ পর্যন্ত একীভূত সত্তারই বিভিন্ন রূপ—'Unity in Diversity'. আর সেই একীভূত সত্তা আদর্শবাদীদের কল্পিত কোন প্রকৃতি বহির্ভূত অলৌকিক বস্তু নয়—পার্থিব বস্তুই। এই বিজ্ঞানসম্মত জড়বাদী জ্ঞানের ফলেই আজ দর্শন ও বিজ্ঞানের বৈষম্যের অবসান হয়ে উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সামঞ্জস্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্যের বিভিন্নতার মধ্যেও চলেছে এই সমন্বয়সাধন। আদর্শ-বাদী দর্শনের প্রভাব আমাদের সমাজ-জীবন থেকে কমে গেলেও আজ পর্যন্ত তা'র অবসান হয়নি এবং হয়নি বলেই এখন পর্যন্ত অনেক বিভ্রান্তিকর মতবাদের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জে,

বি, এস্, হ্যাল্ডেনের নিম্নোক্ত উধৃতিটি স্মরণযোগ্য: "Materialistic thinking in the past has been revolutionary in its effects. It has built up natural science and undermined religion. The same process is going on to-day. We have to realize that our current ideas about society are mostly very like our ancestors, ideas about the universe four hundred years ago—irrational traditions which stiffle progress in the interests of a small minority."—এই যুক্তিহীন সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পেলেই শুধু সমাজ বা সাহিত্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়।

সমগ্র পৃথিবীর পীড়িত মানবতাকে এই অন্ধ সংস্কারের হাত থেকে—এই দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি দেবার প্রচেষ্টা চলেছে স দুনিয়ায়। আদর্শবাদী জীবন-দর্শনের সঙ্গে জড়বাদী জীবন-দর্শনের লেগেছে প্রবল সংঘর্ষ। কবি বা ঔপন্যাসিক এই সংঘর্ষ সম্পর্কে নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকতে পারে না। আজকের দিনের রাজনৈতিক সংগ্রামও এই সংঘর্ষের রূপান্তর। সুতরাং তার ছাপ সাহিত্যে বা শিল্পে না পড়ে পারে কি? যে সাহিত্যে সে ছাপ পড়ে না, সে সাহিত্য বিচারের মাপ কাঠিতে যতই বিশুদ্ধ হোক, জন-সমাজ তা গ্রহণ করবে না, ভাবী যুগের জন-সমাজেও তা গৃহীত হবে না। কেন না বড় সাহিত্যের মধ্যে যে প্রাণ স্পন্দন প্রতিফলিত থাকে, এই যান্ত্রিক সাহিত্যে তা অনুপস্থিত। পৃথিবীতে কল্পনাবিলাসী ভাববাদের অবসান হয়ে এসেছে, একথা কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক এর মত বড় সত্য আর কিছু নেই। মানব সমাজের ভাব-ধারার বিবর্তন সাগ্রহে লক্ষ্য করলেই এ সত্য অনুধাবন করা যায়। তা না করে যিনি চোখ বুজে থাকবেন, তিনিই হবেন বঞ্চিত—মানব সমাজের অগ্রগতি তার জন্যে বন্ধ হয়ে থাকবে না। টমাস ম্যানের মত

বিগত যুগের ভাববাদী সাহিত্যিককেও আজ বলতে শোনা যায় যে, রাজনৈতিক যুগে রাজনীতির হাত থেকে লেখক রেহাই পেতে পারেন না। এ রেহাই পাবার প্রশ্ন নয়— সাহিত্যে বিবর্তনের প্রশ্ন। সমাজ বিবর্তিত হয়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যকেও বিবর্তিত হতে হবে। যাঁর সাহিত্য বিবর্তন-বিরোধিতা করবে, তাঁর সাহিত্যের ধ্বংস অনিবার্য।

এটা রাজনৈতিক যুগ বলে বর্তমানের যে কোন উপন্যাস হাতে তুলে নিলেই দেখা যায় যে, তার অধিকাংশ চরিত্রই রাজনৈতিক জীব—কবিতায়ও রাজনৈতিক ভাবধারার ছড়াছড়ি। বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বত্রই আজ এক অবস্থা। এর কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা আজ এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যার হাত থেকে অবিলম্বে মানব সমাজের মুক্তি আবশ্যক। ধনতন্ত্র তার ঐতিহাসিক প্রগতি-শীলতার ভূমিকা অভিনয় শেষ করে বহু পূর্বেই হয়ে উঠেছে প্রতিক্রিয়াশীল। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধনতান্ত্রিক অবস্থার হাত থেকে মানুষ চাইছে মুক্তি—নিজের ব্যষ্টিসত্তা এবং সমাজের উৎকর্ষ বিধানের জন্য। এ অবস্থায় সমাজ জীবনে রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করার প্রয়াস করা হলে, পরোক্ষে সমাজ-জীবনকেই করা হয় অস্বীকার। আর সে অস্বীকৃতির মানেই সাহিত্যের অপমৃত্যু। এক সময়ে সমাজ জীবনে ধর্ম যেমন পরম সত্য ছিল, আজকের সমাজ-জীবনে রাজনীতিও তেননই পরম সত্য। সেই ধর্মা-দর্শকে কেন্দ্র করে যদি Bunyan's Pilgrim's Progress, মিল্টনের Paradise Lost বা দান্তের Divine Camedyর মত মহৎ সাহিত্য রচনা সম্ভব হয়ে থাকে. তবে আজ রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই বা মহা-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয় কেন ? এর কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ভাববাদীদের জানা নেই। ভাববাদীদের প্রধান বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হবে 'স্বাভাবিক' মানুষ—কিন্তু 'স্বাভাবিক' মানুষ বলে সত্যই কি কোন জিনিষ আছে ? মানুষের মনোবৃত্তি বা হৃদয়বৃত্তি কি তার

পরিবেশের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতেরই সৃষ্টি নয় ? সে দৃষ্টিতে দেখতে গেলে মধ্য যুগের 'ধার্মিক মানুষ' (Religious man) এবং এযুগের 'রাজনৈতিক মানুষ' (Political man) সমান অস্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে এরা কেউ অসত্য নয় এবং মধ্য-যুগের সাহিত্যে 'ধার্মিক মানুষ' যেমন অপাংক্তেয় বলে বিবেচিত হয় নি, আজকের 'রাজনৈতিক মানুষ'কেও তেমনি অপাংক্তেয় বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। বরং আজকের দিনের জড়বাদী জীবনদর্শন মানুষের যে অর্থ-নৈতিক বিমুক্তির কথা বলে, সেই বিমুক্তি সম্ভব হলেই শুধু অস্বাভাবিক মানুষ কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক হবে। কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক হবে এই জন্য বলছি যে যাঁরা সমাজবহির্ভূত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকেই স্বাভাবিকতার মাপকাঠি বলে ধরেন, তাঁদের আশা পূরণ হবে না—সেদিনও বিজ্ঞান-সম্মত সমাজ-ব্যবস্থা থাকবে এবং সেই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই মানুষের ব্যক্তিসত্তা যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ভোগ করবে।

সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এই কথা প্রমাণ করার জন্যে এতটা প্রয়াস পেলাম বলে কেউ যেন মনে না করেন যে নিছক রাজনৈতিক প্রচারকেই আমি সাহিত্য পদবাচ্য বলে মনে করি। আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের কোঠায় উঠলে প্রচারবাদও সাহিত্য হতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, প্রচারবাদ মাত্রই সাহিত্য। তা যদি হত, তবে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের চেয়ে বড় সাহিত্যিক কেউ থাকত না। প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে যে অনুভূতি, যে প্রকাশভঙ্গী, যে জীবন দর্শন প্রয়োজন, তা যদি না থাকে, তবে শুধু রাজনীতি কেন প্রেমের মত বহুপ্রচলিত বস্তুও সাহিত্যের কোঠায় না উঠতে পারে। আমার বক্তব্য এই যে, সব কিছুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হ'তে পারে—প্রেম থেকে রাজনীতি পর্যন্ত। তবে তা সাহিত্যের পর্যায়ে উঠে আসবে কি না সেটা নির্ভর করবে স্রষ্টার সৃষ্টি-শক্তির উপর। প্রতিভাবান সাহিত্যিকের হাতে পড়ে নীরস

রাজনীতিও সরস সাহিত্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার প্রতিভাহীন লেখকের হাতে পড়ে প্রেমের মত সরস বিষয়বস্তুও হয়ে দাঁড়াতে পারে নীরস, নির্জীব। তাই বলে রাজনীতিকে সাহিত্যের মধ্য থেকে ছেঁটে বাদ দেবার অধিকার কারও নেই। আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্য ও রাজনীতি যতই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বলে মনে হোক না—এ-দুয়ের মধ্যে গভীর আন্তরিক যোগ বিদ্যমান। এ-যুগের সাহিত্য সেই কথাই প্রমাণ করে।

॥ আধুনিক সাহিত্যের ভূমিকা ॥

একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর সব সভ্য দেশে আজ যে সাহিত্যিক আন্দোলন চলছে সর্বত্রই তার মধ্যে এমন একটা নতুনত্বের প্রয়াস দেখা যায় যে সাহিত্য-বিচারের কায়েমী আসনে যাঁরা উপবিষ্ট আছেন, তাঁরা তাকে ঠিকভাবে মেনে নিতে পারেন না। আধুনিক সাহিত্যের বিপ্লবাত্মক ভাবধারাকে তাঁরা উচ্ছৃঙ্খলতার অজুহাতে এবং বিশুদ্ধ শিল্পের নজির দেখিয়ে অপাংক্তেয় ক'রে রাখতে চান। বর্তমানে সহিত্যে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন চল্‌ছে তার সুযোগ নিয়ে অনেক অবিবেকী তরুণ সাহিত্যিক যে ভাব এবং ভাষার দিক্ থেকে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে পড়েননি—এমন কথা আমি বল্‌ছি না। তবে এই উচ্ছৃঙ্খলতাকেই যাঁরা আধুনিক সাহিত্য ব'লে মনে করেন, তাঁরা ভুল করেন। কিছুকাল পূর্বে আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও এই তথাকথিত আধুনিকতার উচ্ছৃঙ্খলতা সশব্দে আত্মপ্রকাশ করেছিল; আবার অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিঃশব্দে তার মৃত্যু হ'য়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যে নতুনত্বের আন্দোলন সুরু হয়েছিল তা আজও চল্‌ছে এবং চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জন না করা পর্যন্ত চল্‌বেও। আধুনিক সাহিত্যে নতুন সৃষ্টির চেয়ে সম্ভাবনাই বেশী। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যে নতুন সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হবে, আধুনিক সাহিত্য তারই অগ্রদূত। অজানা নতুন পথে চল্‌তে গেলে বারবার হোঁচট্ খেতে হয়—তাই ব'লে চল্‌বার প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করা চলে না। সহানুভূতি দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যায় যে আজকের নতুন সাহিত্য এমন একটা ভাবী যুগের আশা ও আকাঙ্খায় রঙীন, যার আবির্ভাব এখনও পৃথিবীতে হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে এ সাহিত্যকে অবাস্তব বলে মনে হলেও, এর পিছনে একটা বাস্তব বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

আছে। আধুনিক সাহিত্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে বলেই অনেক সময় অনেকভাবে এর কদর্থ করা হ'য়ে থাকে। একটি ছোট প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যের সকল বিভাগ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু আধুনিক সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়েই আলোচনা করব। পূর্বগামী সাহিত্যের শিল্প-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে মতদ্বৈধই আমার এ প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য।

আজকের দিনে সারা পৃথিবীতে যে সাহিত্যিক আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছে তার প্রাণ-শক্তি যে মার্ক্সীয় জীবন-দর্শনের মধ্যে নিহিত এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ নেই। অনেকে হয়তো মার্ক্সের নাম শুনেই আঁৎকে উঠবেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে সাহিত্যক্ষেত্রে মার্ক্সকে নিয়ে টানাটানি কেন? তাঁরা মার্ক্সকে শুধু অর্থনৈতিক পণ্ডিত এবং রাজনীতিক আন্দোলনকারী বলেই জেনে রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা যে অজ্ঞতাপ্রসূত সে কথা বল্‌তে দ্বিধা নেই। মার্ক্স শুধু অর্থনীতিবিদ্ বা রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না; তিনি ছিলেন নতুন দর্শনের স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্ট নতুন জীবন-দর্শন আজ মানুষের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুরই উপর প্রভাব বিস্তার কর্‌তে চাইছে। ফলে মানব সমাজের পূর্বগামী আদর্শের সঙ্গে এই নতুন আদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আদর্শবাদী দর্শনেরই প্রভাব দেখি বেশী। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে একটা জড়বাদী দর্শনও ধীরে ধীরে পৃথিবীতে শিকড় গাড়ার চেষ্টা কর্‌ছিল। এই জড়বাদী দর্শনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন হেগেল্, হল্‌ব্যাক, হল্‌ভেসিয়াস্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা। কিন্তু এঁরাও সম্পূর্ণভাবে আদর্শ-বাদের হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারেননি। মার্ক্স এসে জড়বাদী দর্শনকে সম্পূর্ণতা দান কর্‌লেন—দ্বান্দ্বিক জড়বাদকে (Dialectical Materialism) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত কর্‌লেন। আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদকেই আশ্রয় ক'রে নতুন

সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে। পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই আজও জড়বাদী দর্শনকে মেনে নিতে পারেননি ; তাই জড়বাদী শিল্পের সঙ্গে তাঁদের মত-বিরোধ। তবে জড়বাদী দর্শনের শক্তি যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এ কথাও খাঁটি সত্য।

মার্ক্সীয় শিল্প-বিচারে আর্টের কোন সমাজ-নিরপেক্ষ সত্তা নেই। 'Art for Arts' sake' নীতির সত্যতাকে আধুনিক সাহিত্য অস্বীকার করে। জীবনের সঙ্গে যে সাহিত্যের কোন যোগ নেই, সে সাহিত্য সাহিত্য পদবাচ্যই নয়। রুশ-বিপ্লবের কবি অ্যালেকজাণ্ডার ব্লক বলেছেন : "Art, life and politics are indivisible and inseparable." আধুনিক সাহিত্যেরও বক্তব্য তাই। ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতির যেমন সমাজ-নিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই, আর্টেরও তাই। সামাজিক পরিবেশ শিল্পীর জীবনে খুব প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পীকে সমাজ-নিরপেক্ষ জীব মনে করা ভুল। শিল্পীর যেমন একটা শ্রেণীগত রূপ আছে, শিল্পেরও তেমনি একটা শ্রেণীগত রূপ আছে। দেশে যখন যে শ্রেণীর উপর শাসন-কর্তৃত্ব থাকে, তখন সেই শ্রেণীর আওতায় সাহিত্যও গ'ড়ে ওঠে এবং তখন সেই সাহিত্যের উপরও সেই শ্রেণীগত রূপের ছায়া পড়ে। এইখানেই প্রাচীনপন্থী 'বিশুদ্ধ' রসের সমর্থক সমালোচকদের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের মতের মিল হয় না। 'বিশুদ্ধ' রস-চর্চার অজুহাতে তাঁরা বলতে চান যে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির একটা শাশ্বত রূপ আছে। নতুন সাহিত্য এই শাশ্বত রূপকে স্বীকার করে না। নতুন সাহিত্য বল্‌তে চায় যে যুগে যুগে সমাজ-ব্যবস্থা যেমন বদ্‌লায়, সামাজিক গঠনও তেমনি বদলায়—সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও রূপান্তর হয়। আধুনিক সাহিত্যিকেরা বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির মত সাহিত্যকেও সমাজের দাস ব'লে মনে করেন। এই জন্যই 'বিশুদ্ধ' রস-শিল্পের সমর্থকরা আজকের সাহিত্যের মধ্যে রস-শিল্পের চেয়ে প্রচারেরই প্রাধান্য দেখতে পান। যাই হোক, আধুনিক সাহিত্যের পিছনে আজ যে একটা বড় আদর্শ কাজ করছে

সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই। আধুনিক সাহিত্য জীবনকে খুব বড় ক'রে দেখছে: ফলে পূর্বগামী সাহিত্যের সর্বপ্রকার কল্পনা-বিলাস এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য মুদ্রাদোষকে আধুনিক সাহিত্য ছেঁটে ফেলবার চেষ্টা করছে। বর্তমানে ক্ষীয়মান ধনতান্ত্রিক আবহাওয়ায় আর যে বড় সাহিত্য সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই—সে কথা সুনিশ্চিত। পিছনে বড় আদর্শ না থাকলে বড় সাহিত্য সৃষ্টি হয় না; ধনতান্ত্রিক আদর্শ আজ ধ্বংসোন্মুখ। ঊনবিংশ শতাব্দীই ছিল ধনতন্ত্রের গৌরবময় যুগ—তাই সে যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছিল। আজকের দিনে ধনতন্ত্রের সমর্থক যাঁরা আছেন, ধনতন্ত্রের উপর তাঁদেরও সে দৃঢ় আস্থা আর নেই। পৃথিবীর সর্বত্র আজ ধনতন্ত্রের বিরোধী শক্তি সমাজতন্ত্র মাথা চাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে। ধনতন্ত্রের শক্তি যেমন আন্তর্জাতিক, তার বিরোধী শক্তি সমাজতন্ত্রের শক্তিও তেমনি আন্তর্জাতিক। তরুণ সাহিত্যিকদের দৃষ্টি তাই আজ সমাজতন্ত্রের দিকেই নিবদ্ধ। সমাজতান্ত্রিকতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ: তাই এই পথেই তাঁরা তাঁদের সাহিত্য-প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছেন। সোভিয়েট্ রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের অপূর্ব সাফল্য যে আধুনিক লেখকদের অনেকটা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে—সে কথা অনস্বীকার্য। যে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য, আধুনিক সাহিত্য তারই রঙে কিছুটা রঙীন। তাই এ সাহিত্যকে কিছু অবাস্তব ব'লে মনে হয়। কিন্তু এ অবাস্তবতার যে কিছুটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সে কথা স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

অনেকের ধারণা আছে যে দুর্বোধ্যতা বোধহয় আধুনিক সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এরূপ ধারণা একেবারেই ভুল। কোন ব্যক্তি-বিশেষের লেখার দুর্বোধ্যতাকে নজির-স্বরূপ ধ'রে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করা খুব অন্যায়। আধুনিক সাহিত্য সর্বদা দুর্বোধ্যতাকে এড়িয়ে চলতেই চায়:

পূর্বগামী সাহিত্যের অনাবশ্যক ভাবালুতা ও বাক্‌বাহুল্য ছেঁটে ফেলে আধুনিক সাহিত্য সোজাসুজি সহজ সরলভাবে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে চায়। আধুনিক সাহিত্য বাক্‌বাহুল্যে মন্থর হ'তে চায় না, চায় বাক্‌সংযমে মুখর হ'তে। তাই ব'লে আধুনিক সাহিত্য কিন্তু বিলাসপ্রিয় পাঠকের জন্য নয়। দ্বিপ্রাহরিক কিংবা নৈশ ভোজনের পর আরাম-কেদারায় ঠেস্‌ দিয়ে পড়্‌বার সাহিত্য এ নয়। কারণ আধুনিক সাহিত্যে বুদ্ধি-বৈদগ্ধের প্রভাব খুব বেশী। আজকের সাহিত্যে হৃদয়বৃত্তির চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির স্থান বেশী : পুরাতন-পন্থী সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের এখানেও একটা বিরাট প্রভেদ রয়েছে। আধুনিক জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবধান অনেকটা সঙ্কীর্ণ হ'য়েছে। তাই দেশগত ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে কেন্দ্র ক'রে বেঁচে থাকা আজকের সাহিত্যের পক্ষে অসম্ভব। রাজনীতি যেমন আজ দেশীয় সীমারেখাকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকতার কোঠায় পোঁছেচে, আধুনিক সাহিত্যও সেই রকম ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে ওঠার প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে। এই প্রয়াসের পিছনে যে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; দেশগত, জাতিগত পার্থক্যের মধ্যেও মানুষের যে একটা সর্বজনীন রূপ আছে—এ শিক্ষা সমাজ-তন্ত্রবাদেরই। আজকের সাহিত্য শুধু দেশীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্যকে অবলম্বন ক'রে বেঁচে নেই—সমস্ত বিশ্বের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেই সে আশ্রয় ক'রেছে।

অনেকের আবার ধারণা আছে যে শুধু ইঁট, কাঠ, লোহালক্কড়, শ্রমিক, জনতা প্রভৃতিকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্য সৃষ্টি কর্‌লেই বুঝি সে সাহিত্য আধুনিক হয়। এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। সাহিত্যের আধুনিকতা নির্ভর করে লেখকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপর। বিষয়-বস্তু আধুনিক হ'লেও দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনাধুনিকতার জন্য অনেক সাহিত্য আধুনিকতার মাপকাঠিতে উৎরায় না। তবে যন্ত্র-যুগে বাস ক'রে কোন কবি যদি ইট, কাঠ, লোহালক্কড় প্রভৃতি নিয়ে প্রকৃত

আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি কর্‌তে পারেন, তাতে আপত্তির কারণ আছে ব'লে মনে হয় না। যে প্রকৃতি এতদিন পর্যন্ত আমাদের কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতিতে প্রেরণা জুগিয়ে আস্‌ছে যন্ত্র-যুগের ক্রমোন্নতির ফলে আমাদের জীবন থেকে তার প্রভাব যে ক্রমশ কমে' আস্‌ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকের কবি ও সাহিত্যিক যে-পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ সেই পরিবেশ যদি তাঁর সাহিত্যিক অনুভূতিকে যথেষ্টরূপে নাড়া দেয়, তবে তাই নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টিতে আপত্তি কোথায়? যন্ত্র-যুগ পৃথিবীতে খুব বেশী দিন ধ'রে সুরু হয়নি; এর মধ্যে যন্ত্রের প্রভাব মানুষের জীবনে প্রকৃতির প্রভাবের মত ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠতে পারে নি। তবে একথাও সত্য যে প্রকৃতির সেই পূর্ব প্রভাব মানুষের জীবনে আর কোন দিনই বোধ হয় ফিরে আসবে না। রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর'—সেটা কোন মতেই সম্ভব নয়—একথা সবাই বোঝেন। মানুষের সভ্যতা চক্রাকারে ঘোরে না—সভ্যতা ক্রমাগত এগিয়েই চলেছে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক যন্ত্র-সভ্যতায় বৈষম্য আছে প্রচুর; কিন্তু আরণ্যক সভ্যতায় ফিরে গিয়ে এ বৈষম্যের মীমাংসা হবে না। এ সমস্যা সমাধানের উপায় এই যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যেই নিহিত আছে।

আর একটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ ক'রেই আমি এ প্রসঙ্গ শেষ কর্‌ব। ইতস্তত যে নতুন সাহিত্যের প্রস্ফুরণের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে থাকা চাই বলিষ্ঠ আশাবাদের সুর। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে আজকের দিনে নতুন সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়। অবশ্য আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উপরে যে সব বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা কর্‌লাম—আজকের দিনে প্রত্যেক তরুণ লেখকের রচনার মধ্যেই যে এই সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এমন কথা আমি বল্‌ছি না। প্রকৃতপক্ষে আজকের দিনে বেশীর ভাগ সাহিত্যের মধ্যেই এ সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়

না। তার কারণ পৃথিবীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে এখন যে যুগটা চল্‌ছে সেটা হ'চ্ছে পরিবর্তনের যুগ (Transitional Period)। এখনও সর্বত্র (সম্ভবত সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া) ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যেরই (Decadent Literature) প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। সাহিত্যকরা অতীত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন—অথচ নতুন বিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছেন না। আজকের অধিকাংশ সাহিত্যে তাই বলিষ্ঠ আশাবাদের চেয়ে নৈরাশ্যেরই প্রাবল্য বেশী। পিছনে কোন বড় আদর্শের প্রেরণা না থাকায় সাম্প্রতিক সাহিত্যে তাই কোন বড় সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। এই ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যের ব্যাপকতার মধ্যেই প্রায় প্রত্যেক দেশে দু'একজন তরুণ সাহিত্যিকের আবির্ভাব হ'য়েছে যাঁরা বর্তমান সাহিত্যের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করছেন। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব এঁদের উপব খুব বেশী। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে এঁরা বলিষ্ঠ আশাবাদী—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সমন্বিত। উপরে লিখিত আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো এঁদের সাহিত্যে প্রকট; তবে সংখ্যায় এঁরা এখনও এত মুষ্টিমেয় যে ব্যাপকভাবে সাহিত্যে এঁদের প্রভাব অনুভূত হ'চ্ছে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে এঁরাই যে আধুনিক সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে যে সাহিত্যিক বন্ধ্যাত্ব সুপরিস্ফুট, সে বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে সৃষ্টির প্রাচুর্য আন্‌তে হয়তো তাঁরা পার্‌বেন না। তবে তাঁরা যে জমির উর্বরতা বিধান কর্‌ছেন, ভবিষ্যতে সে জমিতে ফসল ফলানোর লোকের অভাব হবে না। প্রকৃত আধুনিকতার অগ্রণী এই সব সাহিত্যিককে ভবিষ্যৎ সাহিত্য সাদরে স্মরণ করবে।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য ॥

একথা সর্ববাদীসম্মত যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বহু ভাষা, বহু সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন সংস্কৃতি আছে। এর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যই যেন প্রকারান্তরে প্রতিফলিত। ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতির খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা সকলেই জানেন যে পৃথিবীর প্রায় সকল রকম আবহাওয়া এই ভারতের মাটিতেই পাওয়া যায়। তেমনি মানুষ ও তার সভ্যতার নানা বিচিত্র প্রকাশ হয়েছে এই ভারতে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের নানা বিচিত্র স্তর এই বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেও ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের জনসমাজের বৃহত্তর অংশ আজ যন্ত্রবিপ্লবের পথে প্রগতিশীল জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চললেও এখানে যে আদিবাসী উপজাতিগুলি আছে তারা পড়ে আছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক স্তরে। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের সংবিধানে ১৪টি ভাষা মুখ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ছাড়া যে সব উপভাষা আছে তাদের সংখ্যা শতাধিক তো হবেই। আজও ভারতের এক প্রান্তের লোক অপর প্রান্তের লোকের সঙ্গে প্রথমত ইংরেজী ও দ্বিতীয়ত এবং আংশিকভাবে হিন্দি ভাষার সাহায্য ছাড়া ভাবের আদান প্রদান করতে পারে না। এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা সংস্কৃতিগত ঐক্য যে আছে সে বিষয়ে সংশয় নেই। তা না হলে ভারতবর্ষ একটা দেশ রূপে গণ্য হতে পারত না এবং ভারতীয় জাতির অস্তিত্ব থাকত না। বৃটিশদের আগমনের পূর্বে মোগল পাঠান যুগে এবং তারও পূর্বে হিন্দু রাজাদের যুগে একই ভারতের বুকে খণ্ড খণ্ড একাধিক স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তাই বলে ভারতীয়

সংস্কৃতির বহির্ভূত কোন বিজাতীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব সে সব স্বাধীন রাজ্যে ছিল না। এত কথা বলার অর্থ এই যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ভেদবিভেদ সত্ত্বেও প্রথমাবধি একটা সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূত্র বিদ্যমান ছিল।

বৃটিশ আমলে ভারতের এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরানোর প্রয়াস করা হয়েছিল নানা ভাবে। একটা উপায় ছিল জাতীয় ঐক্যবোধ যাতে সঞ্জীবিত না হয় তার জন্যে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যকে বড় করে তোলা এবং দ্বিতীয় উপায় ছিল ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ঘটানো। ভারতের অনুন্নত হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিচ্ছেদবিষ সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়েছিল। সুখের বিষয়, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস ছাড়া অন্য ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায় বড় একটা সুবিধা করতে পারেন নি। যাই হোক, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান সত্ত্বেও এবং বৃটিশ শাসকদের ভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসের সম্মুখীন হয়েও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসীদের মধ্যে একজাতীয়তাবোধ ও সংস্কৃতিগত ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস হয়। এই কাজে প্রথম অগ্রণী হয়েছিল বাংলা দেশ। এ ব্যাপারে ভারতবাসীদের চিত্তে ভাববিপ্লবের পথিকৃৎরূপে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। ভারত-পথিক রামমোহনকে বাদ দিলে চিন্তানায়কদের মধ্যে আর যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবশ্য তার সঙ্গে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ নেতৃত্বও অবশ্য ছিল বাঙালীদেরই হাতে। বর্তমান প্রবন্ধে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার কথাই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ক্ষেত্রে

রবীন্দ্রনাথের দানের কথা বিশেষভাবে আলোচ্য এই জন্যে যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর গত কয়েক বৎসরে আমরা ভারতের কয়েকটি অঙ্গ রাজ্যে তীব্র ভাষা বিক্ষোভ হতে দেখেছি। এই অতিসম্প্রতিও ভাষার নামে আসামে যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে তার স্মৃতি অনেক দেশপ্রেমিকের মন আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতির দিক থেকে অনেককে আশঙ্কান্বিত করেও তুলেছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ ও সংস্কৃতিগত বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির অর্থই হল আমাদের জাতীয় সত্তাকে দুর্বল করে তোলা। দেশে এই ধরণের একটা অপপ্রয়াস যখন দেখা দিয়েছে তখন ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐক্য সাধনে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী প্রয়াসের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণযোগ্য। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ায় বোম্বাইতে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যে নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়ে গেছে। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু। বোধ হয় ভারতের এই সাম্প্রতিক ভাষা বিক্ষোভ ও সাংস্কৃতিক বিভেদের ঘটনাগুলি সামনে রেখেই তিনি উদ্বোধনী ভাষণে সক্ষোভ মন্তব্য করেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী যে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজ আমরা তার অভাব দেখছি। জীবনের ছোটখাটো জিনিস নিয়েই আমরা আলোচনা করি, ঐক্যের বন্ধনে না বেঁধে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এরূপ বিষয় নিয়ে আমরা বিতর্ক করি।"

শ্রীনেহেরুর এই মন্তব্যের মধ্যে অত্যুক্তি নেই। তবে, কেন দেশের চিন্তাধারায় এই অসুস্থতা এসেছে, কেন আমরা দেশ ও জাতি অপেক্ষা আঞ্চলিক স্বার্থকেই বড় করে দেখতে আরম্ভ করেছি—সেটা আলাদা গবেষণার বিষয়। আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য সম্বন্ধে যা বলে গেছেন এবং নিজের জীবনে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য বোধের যে প্রমাণ দিয়ে গেছেন তাই। ভাষা যে একটা গোষ্ঠী

বা জনসমাজের সংস্কৃতির প্রধান বাহন—ভাষার যাদুকর রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তা অন্য কেউ বেশি জানতেন না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত বাঙ্গালী কবি এবং বাংলা ভাষাতেই তিনি তাঁর শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি রেখে গেছেন। তাঁর একক শক্তিতে বাংলাকে তিনি বিশ্বের প্রগতিশীল শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির সমপর্যায়ে টেনে তুলেছিলেন। সুদীর্ঘ সার্ধ শতাব্দীকাল যে ভাষার চর্চা তিনি করেছিলেন তাকে যে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বদেশী যুগে তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল

"বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক।"

বাংলা ভাষার শক্তি, সৌন্দর্য ও প্রকাশ-কুশলতা সম্বন্ধে কবির মনে কোন সংশয় না থাকলেও তাঁকে কোনদিন ভারতের অন্য কোন ভাষা বা সাহিত্যকে নিন্দা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে দেখা যায় নি। কবির বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষার প্রশস্তিমূলক কবিতাগুলি যদি আমরা পড়ি, যদি তাঁর ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি আমরা পড়ি, তাহলে দেখতে পাব যে নিজের প্রদেশ বা নিজের মাতৃভাষাকে বড় প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি কোথাও ভারতের অন্য কোন প্রদেশ বা ভাষার নিন্দা করেন নি। একই সঙ্গে কি করে খাঁটি বাঙালী ও খাঁটি ভারতীয় হওয়া যায় এ তারই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তেমনই খাঁটি ভারতীয় ও স্বদেশপ্রেমিক হয়েও যে বিশ্বপ্রেমিক হওয়া চলে তাও রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করে গিয়েছেন নিজের জীবনে। বাংলার মত ভারতের প্রশস্তিমূলক বহু গান ও কবিতাও তাঁর আছে। এই সব গান বা কবিতায় কোথাও নিজের দেশকে বড় করে তুলতে গিয়ে কবি পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা জাতিকে ছোট করার প্রয়াস পেয়েছেন এরূপ উদাহরণ দেখা যায় না। কি ধরণের যুক্তিবাদী মন হলে এ ধরণের অপূর্ব ভারসাম্য বজায় রেখে চলা যায় তা সহজেই

অনুমেয়। যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "বাংলার মাটি, বাংলার জল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক"-এর মত বঙ্গপ্রেমের অপূর্ব কবিতা, তিনিই আবার রচনা করেছেন "অয়ি ভুবন-মন মোহিনী"-র মত অপূর্ব ভারত বন্দনামূলক কবিতা এবং "জন গণ মন অধিনায়ক"-এর মত সুন্দর জাতীয় সঙ্গীত। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রাদেশিক চেতনা ও বৃহত্তর জাতীয় চেতনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেই রবীন্দ্রনাথই আবার নিজের সত্তাকে আরও অনেকটা প্রসারিত করে বিশ্ব পথিক রূপে লিখেছিলেন "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—

অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।"

ভারতের ইতিহাস-সচেতন কবির মনে ভারতের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা সম্বন্ধে গভীর আত্মপ্রত্যয় থাকবে এটা স্বাভাবিক। এরও উর্ধ্বে তিনি যে উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন সেটা হল বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্যের অস্তিত্ব। আমাদের দেশেরই কবি গেয়েছিলেন,

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি সবে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

এই ধরণের অখণ্ড সাংস্কৃতিক বোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল। আর এই বোধ ছিল বলেই তিনি সুযোগ এলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ডাকে সাড়া দিতেন। এই জাতীয় বিদেশ ভ্রমণের পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষকে জানা এবং তাদের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ভাল দিকগুলিকে তিনি আত্মস্থ করতে কুণ্ঠিত হতেন না এবং নিজের শিক্ষায়তন শান্তিনিকেতনে সেগুলি রূপায়িত করে তোলারও চেষ্টা করতেন। কবির গভীর বিশ্বাস ছিল যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির সমন্বয় সাধিত হবে। কবির এ স্বপ্ন

কোন দিন সার্থক হয়ে উঠবে কিনা—সে অবশ্য একটা স্বতন্ত্র জটিল প্রশ্ন। সে আলোচনার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধে নেই।

বিশ্বপ্রেমিক হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশকে অন্তর থেকে ভালবাসতেন বলে স্বদেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর চেতনা ছিল প্রখর এবং এই সাংস্কৃতিক ঐক্যকে তিনি নানা ভাবে ভাষায় ও কার্যে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন জীবনে। কবির কাছে তাঁর স্বদেশ শুধু মৃন্ময় ছিল না, সে ছিল চিন্ময়। এই স্বদেশের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন ; "আমার স্বদেশ, আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃ-পিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তান-সন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদদাতা স্বদেশ।" এভাবে স্বদেশের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান রূপ আমরা মানসপটে একবারও দেখার চেষ্টা করি কি ? করি না বলেই আমরা আঞ্চলিক স্বার্থ নিয়ে মাতামাতি করি, অত্যন্ত অদূরদর্শীর মত যা আপাতরমনীয় তাতেই মুগ্ধ হই। ভারতবর্ষের চিরন্তন সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনা কত প্রখর ছিল নীচের উদ্ধৃতি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে : "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়-রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করা।" নানাপ্রকার বিভেদ সত্বেও ভারতের এই অখণ্ড সামগ্রিক রূপ কবিকে কিরূপ মুগ্ধ করত, নীচের উদ্ধৃতির মধ্যেও তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে : "উত্তরে হিমালয়ের পাদমূল হইতে তরঙ্গ মুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত নদীজাল জড়িত পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে

তাহাকে সম্ভাষণ করো, মুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো।" কবির ভারত-সংস্কৃতিচেতনা কত অসাম্প্রদায়িক, কত উদার এবং কত গণতান্ত্রিক এই উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়। ভারত-সংস্কৃতির এই অখণ্ডতাবোধ কবির নিছক ধ্যানলব্ধ বস্তু নয়—তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যে আস্থাবান হয়ে উঠেছিলেন। স্বপ্নভঙ্গ ও আশাভঙ্গের কারণ কবির জীবনে বারবার দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্বদেশ-প্রীতির ব্যত্যয় হয়নি কোনদিন। তাই কবি নিঃসংশয় চিত্তে এমন কথাও বলেছেন যে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, দুঃখ ও দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও তিনি ভারতকেই সর্বাধিক ভালবাসেন এবং তিনি ভারতের মাটীতেই বারবার জন্মগ্রহণ করতে চান।

নিজের অন্তরে এই সুতীব্র স্বদেশ প্রীতি ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে সুগভীর বিশ্বাস ছিল বলেই ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কণামাত্র অশ্রদ্ধা ছিল না কবির মনে। বরং নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে ভালবেসেও তিনি অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে ভালবাসতে পেরেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই ধরণের উদার মনোভাব রবীন্দ্রনাথের আগে বা পরে অন্য কোন ভারতীয় সাহিতিক্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর ছিল অসামান্য প্রভাব। ভারতের চিন্তাশীল ও সাহিত্যরুচিসম্পন্ন সকল শ্রেণীর জনসমাজের কাছে ছিলেন তিনি সমান প্রিয়। তাঁকে আমরা একাধিকবার হিন্দি ও গুজরাটি প্রভৃতি সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে দেখেছি। এই রকম উপলক্ষে তিনি হিন্দিতে নিজের ভাষণ দিয়েছেন এরূপ উদাহরণও দুর্লভ নয়। আজ স্বাধীন ভারতে এর বিপরীত দৃশ্যই প্রায় আমরা

দেখতে পাই। আমি যেমন আমার প্রতিবেশী সাহিত্যের খোঁজ রাখি না, আমার প্রতিবেশী রাজ্যের সাহিত্যিকগণও আমার বাংলা সাহিত্যের খোঁজ রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। এর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এটা সুস্থতার লক্ষণ নয়। যে হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা নিয়ে আজ তুমুল আন্দোলন চলেছে সে সম্বন্ধে কবির মতবাদ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। আজ হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা বিষয়ে ভারতবাসীরা যেন দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন। এক দল উগ্র হিন্দিপ্রেমিক চাইছেন অবিলম্বে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে। আর যাঁরা হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রবর্তনের একেবারে বিরোধী তাঁরা ভাষা হিসাবে হিন্দির নানা দোষত্রুটি দেখিয়ে একে একেবারে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করছেন। এই হিন্দিভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পূর্বে ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে যা বলেছিলেন তা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। মহাত্মা গান্ধী তখন হিন্দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ পরিচালনায় প্রয়োগ করার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটি চিঠিতে কবির সুচিন্তিত মত জানতে চেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে কবি গান্ধীজীকে লেখা তাঁর চিঠিতে বলেছেন: "Hindi is the only possible national language for inter-provincial intercourse in india. But about its introduction at the Congress I think we cannot enforce it for a long time to come...... Hindi will have to remain optional in our national proceeedings until new generation of politicians fully alive to its importance, pave the way towards its general use by constant practice as a voluntary acceptance of a national obligation." হিন্দিকে জাতীয় ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে কবির যে ধৈর্যধারণের উপদেশ

আজ ৪০ বৎসর পরেও তা অর্থহীন হয়নি। অথচ হিন্দিই যে ভারতের একমাত্র সম্ভাব্য জাতীয় ভাষা এ বিষয়ে কবির সন্দেহ ছিল না। কবির এই পত্রের মধ্যে তাঁর গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধির রূপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি যে কত তীক্ষ্ণ ছিল তার প্রমাণ পাই যখন আমরা দেখি যে স্বাধীন ভারতে হিন্দি যে একদিন রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি জানাবে এ সত্য তিনি দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। হিন্দি ভাষার এই ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের পটভূমিতেই কবি ১৯৩৮ সালে বিশ্বভারতীতে হিন্দি চর্চা ও গবেষণার জন্যে "হিন্দিভবন" প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিলেন। হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কবির যোগাযোগ ঘটেছিল এরও প্রায় ৩০ বৎসর আগে যখন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন প্রথম শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দিয়েছিলেন। কাশীতে মানুষ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন ছিলেন হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত। হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে কবির দীক্ষাগুরু ছিলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। তাঁরই মাধ্যমে হিন্দি সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে কবি মধ্যযুগের সন্ত কবিদের হিন্দি কবিতা ও দোহা পড়ে মুগ্ধ হন। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই ক্ষিতিমোহন হিন্দি থেকে এই সব কবিতা ও দোহা বাংলায় অনুবাদের কাজে হাত দেন। ক্ষিতিমোহনের অনূদিত কবীরের দোহাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি দোহা নিয়ে ইংরাজীতে One Hundred Poems of Kabir নামে সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর ইউরোপে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে বেশ সাড়া পড়ে যায় এবং ইউরোপে বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের কিরূপ অনুরাগী ছিলেন তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদূ' নামক গ্রন্থের ভূমিকা থেকে। এই ভূমিকায় কবি লেখেন ঃ "ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরো কোনো

কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার সন্দেহ নেই যে, হিন্দি ভাষায় একদা যে গীতি-সাহিত্যের আবির্ভাব হয় তার গলায় অমর সভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আছন্ন; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দি ভাষা জানে না তারাও যেন এই চিরকালের সাহিত্যে আপন আপন উত্তরাধিকার-গৌরব ভোগ করতে পারে।" হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কবির।

সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এমনই উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একদা প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে কবি কলিকাতা থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে বীরভূমের পল্লী এলাকায় শান্তি-নিকেতনে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পত্তন করেছিলেন তার আদি উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ প্রবর্তন করা। এ সম্বন্ধে তিনি একদা বলেছিলেন: "আমি ভারতবর্ষীয় আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই—তাহাদিগকে সর্ব প্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই।" বলা বাহুল্য, কবির পরবর্তী জীবনে মানসিক বিবর্তনের সাথে সাথে এ ভাবধারার পরিবর্তন ঘটেছিল। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছিল বিশ্বভারতীর কর্মাদর্শে—যে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যে ছিল সমগ্র পৃথিবার সকল দেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে ভারতের মিলনভূমিতে একত্রিত করা। তাই একক প্রচেষ্টায় দেশীয় ধনিকবর্গের এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় যতদূর সম্ভব তাঁর কর্মাদর্শকে রূপায়িত করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন কবি। প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে তাঁর স্বপ্ন পুরাপুরি কার্যে রূপায়িত হতে হয়তো পারে নি। কিন্তু পরাধীন ভারতে রাষ্ট্রশক্তির অসহযোগিতা সত্ত্বেও এই মহান প্রতিষ্ঠান

সংগঠনে যে কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছিলেন এবং এই কাজে দেশীয় এবং বিদেশীয় মনীষীদের যে সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন তা রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বসংস্কৃতির মিলন যেমন বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ছিল, তেমনই ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য ও অখণ্ডতা সৃষ্টিও তার অন্যতম আদর্শ ছিল। কবি চেয়েছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নানা সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটাতে এবং সেই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফল স্বরূপ মুক্ত মানসিকতার অধিকারী ভারতীয় যুবশক্তিকে গড়ে তুলতে। নৃত্য এবং সঙ্গীত যে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত এ সত্য ভারতায় মনাষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন এবং বিশ্বভারতাতে তাকে রূপায়িত করে তুলতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হিসাবে বহু নিন্দার সন্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। আজ প্রায় সকল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত। ভারতীয় সংস্কৃতির দুটি প্রধান বাহন নৃত্য ও সঙ্গীতের ব্যাপারেও কবির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার এবং এক্ষেত্রেও বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতি পদ্ধতির সংমিশ্রণে তিনি এক নতুন ভাব-বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। সর্বত্র ভ্রমণকালে তিনি যখনই যেখানে সঙ্গীতে ও নৃত্যে বিশেষ কোন মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব দেখতে পেতেন তখনই সেখান থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা আমদানি করার চেষ্টা করতেন শান্তিনিকেতনে। এমনই ভাবে শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ও নৃত্যের শিক্ষক শিক্ষিকা এসেছিলেন মণিপুর, ত্রিপুরা, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট ও মাদ্রাজ থেকে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় সংস্কৃতির সুগভীর ঐক্য-চেতনাই গভীরভাবে প্রতিফলিত। আজ রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে ভারতের কল্যাণকামী প্রতিটি নরনারীর উচিত ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা এবং তাঁর সাহিত্যশিল্প ও কার্যধারাকে বিশ্লেষণ করে তাঁর এই ঐক্যবোধকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা।

॥ আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ ॥

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে সুদূর পাড়াগাঁয়ে যখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম, তখন বাংলা পাঠ্য পুস্তকে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম ; নাম 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে,' লেখক জগদীশচন্দ্র বসু। সেই প্রবন্ধটির বিষয়-বস্তু আজও স্পষ্টভাবে মনে আছে। আর মনে আছে তার কতকগুলি বিশেষবিশেষ কাব্যিক পংক্তি। এই প্রবন্ধের যে বিশেষ পংক্তিটি আজও স্মৃতিপটে সমুজ্জল হয়ে আছে সেটি হল ঃ 'নদি তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ,' ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই, 'মহাদেবের জটা হইতে।' ছোট বেলায় এই প্রবন্ধের এই বিশেষ পংক্তিটি মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। পরিণত বয়সেও মনের কাছে তার আবেদন এতটুকু কমে নি। প্রবন্ধ, বিশেষ করে স্কুল পাঠ্য কেতাবের প্রবন্ধ পড়তে ছোট বয়সে আদৌ ভাল লাগে না। বলতে দ্বিধা নেই 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' ছিল তার তীব্র ব্যতিক্রম। বার বার উচ্চকণ্ঠে পড়েও অতৃপ্তি আসত না। যিনি এই সরস সুখপাঠ্য প্রবন্ধের লেখক তাঁর যে একটা কবি-মন আছে, সেই ছোট বয়সেই অস্পষ্টভাবে সেটা যেন অনুভব করতে পেরেছিলাম। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধ-লেখক বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের বহুমুখী চরিত্রের এবং কর্ম-প্রয়াসের বিস্তৃত বিবরণ সেদিন আমার জানা ছিল না। সুতরাং সেই কিশোর বয়সে 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' মনের উপর যে গভীর রেখাপাত করেছিল তার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। এর পূর্ণ কৃতিত্ব জগদীশচন্দ্রের লেখনী-নৈপুণ্যের।

আজীবন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক হলেও সাহিত্যপ্রেম যে জগদীশচন্দ্রের স্বভাবজ ছিল তা জানতে পেরেছি পরবর্তী জীবনে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি যাঁরা বৈজ্ঞানিক তাঁরা

সাহিত্য নিয়ে সাধারণত মাথা ঘামান না। কিংবা মাথা ঘামালেও বৈজ্ঞানিকদের রচনায় সাহিত্যিক উৎকর্ষ সে পরিমাণে থাকে না। জগদীশচন্দ্র এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কর্মবহুল জীবনে মাতৃভাষায় তিনি যে সব বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলির তুলনা পাওয়া দুষ্কর। তিনি যে যুগে: এইসব বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখায় হাত দিয়েছিলেন সেই যুগের কথাটাও এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তিনি বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনায় হাত দেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে অর্থাৎ প্রায় ৬৮ বৎসর আগে। সহজ সরস বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ যে লেখা চলে সে যুগে সে কথা প্রায় অকল্পিত ছিল। জগদীশচন্দ্রের পরবর্তী কালে গত ৫০ বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষায় কিছু কিছু ভাল বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলিয় সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে বিশেষ করে আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য। নিজে সরকারী চাকরীর নিগড়ে বাঁধা থেকেও নানাবিধ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে জগদীশচন্দ্র দেশের যে বিজ্ঞান সাধনার ঐতিহ্য স্থাপন করেছিলেন তা অনুসরণ করে বাংলা দেশে অনেক বড় বড় বিজ্ঞান-সাধক আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার কথা ভাবেন নি। এদিক থেকে বিচার করলে জগদীশচন্দ্রের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা অনন্যসাধারণ। জীবনের নানা সময়ে বাংলা ভাষায় যে সব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিবন্ধ তিনি রচনা করেছিলেন সেগুলি একত্রিত করে পরবর্তী কালে 'অব্যক্ত' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের আজীবনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য জগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। রবীন্দ্রনাথের কাছে একখণ্ড 'অব্যক্ত' পাঠিয়ে সেদিন জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন: 'বন্ধু, সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময়ে সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির

প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।' গ্রন্থখানির প্রাপ্তি স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন তা পড়লে বোঝা যায় তিনি জগদীশ-চন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা সম্বন্ধে কত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "বন্ধু, তোমার 'অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্বপরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বার ভাবিয়াছি যে, যদিও বিজ্ঞান বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ, তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।" জগদীশচন্দ্রের মধ্যে মৌলিক সাহিত্য রচনার যে ক্ষমতা ছিল তা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রের যে প্রেম ও প্রীতি ছিল তা সৃষ্টির মূলেও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির সঙ্গে তাঁর সাহচর্যের সূত্রপাত হয় যৌবনে—যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক-রূপে তিনি ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন। দুজনের সাহচর্য ক্রমে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। জীবনের দুই ভিন্ন ক্ষেত্রের দুই প্রতিভাবান ব্যক্তি পরস্পরের গুণগ্রাহী হয়ে দাঁড়ান। নানাবিধ আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনাকে অব্যাহত রাখার পিছনে রবীন্দ্রনাথের দান কম ছিল না। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের উপরে জগদীশচন্দ্রের প্রভাবও কম ছিল না। কবির সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের যখন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল, তখনও কবির ভাগ্যে পরিপূর্ণ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা জোটে নি। সে অবস্থায় জগদীশচন্দ্র তাঁকে নিত্য নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ বড় কম কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি ইংরেজিতে 'On the Edges of Time' নামে পিতৃ-স্মৃতিবিষয়ক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি ঠাকুর পরিবার, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বিবরণ দিয়েছেন। রথীন্দ্রনাথ প্রদত্ত

বিবরণ থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় প্রথমে 'খাম-খেয়ালী সভা' এবং পরে 'বিচিত্রা' নামে যে দুটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অন্যতম উৎসাহী সদস্য ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। সে যুগে যাঁরা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা দেশে নতুন আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন 'খামখেয়ালী সভা' ও 'বিচিত্রা' ছিল তাঁদেরই প্রতিষ্ঠান। বৈজ্ঞানিক সত্তাই যদি জগদীশচন্দ্রের চরিত্রের একটি মাত্র রূপ হত তাহলে তিনি এদুটি সংস্থার কোনটির প্রতিই আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করতেন না। তিনি এই উভয় সংস্থার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন এইজন্যে যে তাঁর বিজ্ঞান সাধনার আড়ালে একটি শিল্পীসত্তা লুকিয়ে ছিল এবং সেই সত্তা এই জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তি খুঁজত। এই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথের প্রদত্ত আর একটি বিবরণও স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারী দেখাশুনার কাজের জন্যে শিলাইদহে নদীর তীরে বসবাস করতেন, তখন শিলাইদহে কবির কাছে প্রায় প্রতি শনিবারেই যেতেন জগদীশচন্দ্র। শিলাইদহে পদ্মার চরভূমি তাঁকে অপরিসীম তৃপ্তি দিত। তার আগে জগদীশচন্দ্র ইউরোপের বহু দেশ বেড়িয়ে এসেছিলেন এবং সে সব দেশের নানা ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বালক রথীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে দেশ-বিদেশে স্বাস্থ্যোদ্ধারের বহু ভাল জায়গা তিনি দেখেছেন, তবে তাঁর মতে পদ্মার চরভূমির মত স্বাস্থ্যকর স্থান পৃথিবীর কোথাও নেই। শিলাইদহে অবস্থানকালেই করি তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র অধিকাংশ গল্প লিখেছিলেন এবং রথীন্দ্রনাথের মতে এর অনেক গল্পই লেখা হয়েছিল কবি-বন্ধু জগদীশচন্দ্রের ঐকান্তিক তাগিদে। সপ্তাহ শেষে জগদীশচন্দ্র যখনই শিলাইদহে যেতেন, তখনই কবির কাছে শুনতে চাইতেন তাঁর নতুন লেখা গল্প। সুতরাং কবিকে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বন্ধুকে খুশী করার জন্যে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটি

করে গল্প লিখে রাখতে হত। এইভাবে তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলির অধিকাংশ রচিত হয়েছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার পিছনে জগদীশচন্দ্রের প্রেরণা কিছুটা ছিল, একথা বলাটা কি অন্যায়?

সাহিত্যপ্রীতি ছিল জগদীশচন্দ্রের মধ্যে সহজাত এবং সে সাহিত্যপ্রীতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলে। তাঁর চরিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিদের মত পূর্ণতা লাভের একটা গভীর প্রয়াস দেখা যায়। মানুষের এই পূর্ণতার সাধনা হল খাঁটি ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতীক। মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন দিক আছে এবং প্রকৃত মানুষের উচিত তাঁর চরিত্রের সকল দিককে প্রস্ফুটিত করে তোলার প্রয়াস করা। এমনই পূর্ণ মানুষের রূপ দেখি আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, এমনই একটি রূপ দেখা যায় জগদীশচন্দ্রের মধ্যেও। তাই আজীবন জটিল বৈজ্ঞানিক সাধনায় নিয়োজিত থেকেও তিনি তাঁর শিল্পীসত্তাকে ভুলতে পারেন নি— ভুলতে পারেন নি সমাজের অন্য দশ জনের কাছে তাঁর দায়িত্বকে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সব দিকেই পরাধীন দেশের অগ্রগতি সূচিত হোক, এই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। তাঁর জীবনধারা বিশ্লেষণ করলে এই মৌলিক সত্য আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য নয়। আমরা যে যুগে বাস করছি তাকে খণ্ডিত ব্যক্তি-সত্তার যুগ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এযুগে আমরা যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়াকেই জীবনের চরম সত্য বলে ধরে নি। ফলে গোটা মানুষের অভাব এযুগে সহজেই চোখে পড়ে। যিনি বিজ্ঞানসাধক, তাঁর মধ্যে আমরা শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান বা রুচিবোধের প্রত্যাশা করি না। এই বিশেষজ্ঞতা-প্রীতি আমাদের ব্যক্তিত্বকে ভয়ানকভাবে খণ্ডিত করেছে। এমনকি শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে সব উপবিভাগ আছে সেখানেও দেখি এই ধরণের খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। একটু উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। মনে করুন, কবিতা, কথাসাহিত্য ও

নাটক—সাহিত্যের এই তিনটি প্রধান উপবিভাগ। আজকের দিনে যিনি কবি, তিনি হয়তো তাঁর সমসাময়িক কালের কথাসাহিত্য ও নাট্য-সাহিত্যের সম্যক সংবাদ রাখেন না। বিপরীত দিক থেকে, কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকারদের সম্বন্ধেও এই একই উক্তি সত্য। অথচ এঁরা সকলে একই সাহিত্য-সরস্বতীর উপাসক। জগদীশচন্দ্র যে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন, তখন এই ধরণের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি-কোণের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যেত না। তাঁরা জীবনকে একটা অখণ্ড সত্য হিসাবে গ্রহণ করতেন এবং জীবনের সকল বিভাগ ও সর্বপ্রকার রস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের উপরই কিছুনা কিছু গুরুত্ব আরোপ করতেন।

জীবনের অখণ্ড সত্যোপলব্ধি জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রে আরও বড় হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে জড় ও চেতন পদার্থের তথাকথিত বিভেদ বিলুপ্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। এ প্রয়াস দেখেছি আমরা প্রাচীন আর্য ঋষিদের মধ্যে, দেখেছি মহাকবি কালিদাসের মধ্যে, দেখেছি পাশ্চাত্যের দরদী কবি শেলীর মধ্যে। সমস্ত জড় জগতের পিছনে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন ত্রিকালদর্শী ঋষি। পাশ্চাত্যের কবি শেলী সেই একই সত্যকে রূপ দিয়েছেন তাঁর কবিতার মধ্যে। কিন্তু কেউ তাঁরা বিজ্ঞানী ছিলেন না বলে তাঁদের এ অনুভূতিকে তাঁরা বৈজ্ঞানিক সত্যে রূপান্তরিত করে যেতে পারেন নি। অনুভূত সত্যকে বৈজ্ঞানিক সত্যে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা জগদীশচন্দ্রকে এক অর্থে বৈজ্ঞানিক কবিও বলতে পারি। কবি শেলী জড় প্রকৃতির পিছনে অনুভব করতেন একটা জীবন্ত প্রাণের লীলা। সে লীলা তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর অনবদ্য কবিতাগুলিতে। কিন্তু তাকে তিনি বিজ্ঞানের সত্যে রূপান্তরিত করতে পারেন নি। জগদীশচন্দ্রও প্রকৃতির পিছনে এই প্রাণলীলা দেখতে পেয়েছিলেন কবির দৃষ্টিতে

এবং পরে তাকে রূপান্তরিত করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সত্যে। উভয়ের মধ্যে মৌল সাদৃশ্য অনেকখানি—বিভিন্নতা শুধু সময়ের ও বৈজ্ঞানিক মাপজোপের।

যাই হোক, জগদীশচন্দ্রের এই যে সাহিত্যকৃতী ও সাহিত্য-প্রীতি তার কথা আমরা আজ ভুলে যেতে বসলেও সমসাময়িক কাল তা ভোলেনি। বরং সমসাময়িক কাল তার যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছিল তাঁকে ১৯১১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি পদে বরণ করে। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃত কৃতিত্বের অধিকারী না হলে সাধারণত এ সম্মান দেওয়া হত না। জগদীশচন্দ্র যে বৎসর প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সে বৎসর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ শহরে। জগদীশচন্দ্র যে কিরূপ গণতন্ত্রপ্রিয় ছিলেন এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর যে কি গভীর প্রীতি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সময়ের একটি ঘটনায়। সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি রূপে জগদীশচন্দ্র ময়মনসিংহ যাবেন শুনে ঐ শহরের বহু গণ্যমান্য লোক বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র কর্তৃক আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দেখতে এবং তাঁর মুখ থেকে সেগুলির কার্যকলাপের ব্যাখ্যা শুনতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব করে পাঠান যে সাহিত্য সম্মেলনের সময় তিনি একটি পাবলিক হলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে নিজের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন এবং তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করবেন। তাঁরা আরও জানান যে সভাস্থলে ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে তাঁরা টিকিটের ব্যবস্থা করবেন। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করতে ও বক্তৃতা করতে রাজী হলেন বটে—তবে টিকিট করে সভাগৃহে লোকের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করতে তিনি অসম্মত হন। ফলে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী স্থির হয় যে তিনি একই হলে পর পর দুদিন বক্তৃতা দেবেন এবং যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করবেন।

প্রথম দিন তিনি ইংরেজি-জানা নরনারীদের জন্যে ইংরেজি ভাষায়

বক্তৃতা করেন এবং দ্বিতীয় দিন বক্তৃতা করেন বাংলা ভাষায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাংলা ভাষায় তাঁর এই দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা হয়েছিল অপূর্ব। বিজ্ঞানের সব কঠিনতম বিষয় তিনি সহজ সরস মাতৃভাষায় এমন করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে শ্রোতৃমণ্ডলী মাতৃভাষার উপর তাঁর আশ্চর্য দখল দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এই ঘটনার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের চরিত্রের গণতন্ত্রপ্রিয়তা এবং মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণই কি ফুটে ওঠেনি? আজকের দিনেও আমাদের দেশের কয়জন বিজ্ঞানবিদ্ এভাবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা করতে পারবেন—তা আমার জানা নেই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জগদীশচন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত এই আদর্শ যে আজও আমাদের অনুসরণযোগ্য—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সর্বদা কর্মব্যস্ত এই বিজ্ঞান সাধক যেরূপ মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতি দেখিয়ে গেছেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

॥ বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের শিল্পানুরাগ ॥

সম্প্রতি আমরা সারা ভারতবর্ষে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করেছি। পরাধীন ভারতে নানাবিধ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে যিনি বিজ্ঞান চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, স্বাধীন ভারতে তাঁকে স্মরণ করে আমরা জাতীয় সত্তারই মর্যাদা দিয়েছি। শতবার্ষিকী উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রের বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের কথা নানাভাবে নানা পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। আমি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি এখানে তাঁর বহুমুখী চরিত্রের অন্য একটি স্বল্প-আলোচিত দিকের প্রতি পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটি হলো তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত শিল্পানুরাগ। তাঁর চরিত্রের এই প্রবল শিল্পানুরাগ লক্ষ্য করে শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য পত্রান্তরে একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন ঃ "জগদীশচন্দ্র যদি একজন বড় বিজ্ঞানী না হতেন তবে একজন বড় শিল্পী হতেন।" যাঁরা বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তি তাঁদের সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে তাঁরা জীবনের যে ক্ষেত্রেই নিযুক্ত থাকুন, সেখানেই নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন। এ উক্তি সব সময় সর্বাংশে সত্য নাও হতে পারে, কেননা প্রতিভা প্রায় ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব আত্মপ্রকাশের পথ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গেই খুঁজে বের করে নেয় এবং সেই পথ অনুসরণ করেই প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিজেদের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে যান মহাকালের বুকে। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক না হয়ে যদি ঘটনাচক্রে শিল্পকলাকে তাঁর উপজীব্য করতেন, তাহলে শিল্পী হিসাবে তিনি বোধহয় নগণ্য হতেন না। জগদীশচন্দ্রের এমনই আর একটি অবজ্ঞাত দিক হলো তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন

তাঁর 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন রচনাবলীতে। অর্ধ শতাব্দী কালেরও আগে যখন বিজ্ঞানচর্চাই ছিল ভারতে নতুন, তখন বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার কথা বড় একটা কারও কল্পনায় আসত না। সেই যুগে জগদীশচন্দ্র এমন সাবলীল সুন্দর বাংলায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখেছিলেন যে সেকথা ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয়। তাঁর 'অব্যক্ত' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন, "তোমার 'অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্ব পরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া অনেকবার ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞান বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ, তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র মূলত বিজ্ঞানী হলেও তাঁর চরিত্রে শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি একটা তীব্র সহজাত আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণই তাঁকে যৌবন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এবং উভয়ের গুণগ্রাহিতার মাধ্যমে সে আকর্ষণ রূপ নিয়েছিল অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের। তাঁর চরিত্রের এই যে শিল্পানুরাগ, এই যে কবিদৃষ্টি তাই হয়তো তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল জড়বস্তুর প্রাণ অনুসন্ধানে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার যে উক্তি করেছিলেন তার মধ্যেও জগদীশচন্দ্রের এই কবি-সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার বলেছিলেন: "He was a poet among biologists. Shelley, had he gone on with science, and had he lived in the days of exact measurements, might have shared in his (Bose's) work."

একদিক থেকে দেখতে গেলে কবি ও শিল্পীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য বড় একটা নেই। এঁরা দুজনেই দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা।—তফাৎ শুধু উভয়ের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমের। একজনের আত্মপ্রকাশের

মাধ্যম হলো লেখা আর অন্য জনের রেখা। তা নইলে শিল্পী-সত্তা উভয়েরই প্রায় এক। জগদীশচন্দ্র যে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ, সেই উনবিংশ শতাব্দী শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্মরণীয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দী জন্ম দিয়েছে বহু উল্লেখযোগ্য মনীষীর। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই যুগটি আরও বিশেষ করে স্মরণীয় এই জন্যে যে এটী ছিল পরাধীন ভারতের নব জাগরণের যুগ। জাতীয় জীবনে সেদিন দেখা দিয়েছিল বিরাট ভাববিপ্লব এবং তার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনার উপর। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তখন সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র আলোড়নের এবং সে আলোড়নের ছোঁয়াচ থেকে বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্রও মুক্তি পান নি। বিজ্ঞান সাধনার নামে গজদন্ত মিনার নির্মাণ করে তার মধ্যে তিনি একদিনের জন্যেও বাস করেন নি। তাঁর বিজ্ঞান সাধনার পিছনে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন মাতৃভূমির হৃত গৌরব জগৎ সভায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা ও বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করা। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র যে কত বড় স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন তার পরিচয় পাই নিম্নোদ্ধৃত তাঁর নিজেরই রচনাংশ থেকে, "যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।"

বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্রের এই বহুমুখী চরিত্রের কথা যখন ভাবি তখন সত্যই বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। একই সঙ্গে একই লোকের চরিত্রে কি করে এমন বিচিত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমন পরস্পর-বিরোধী গুণাবলীর সমাবেশ হয়? বিশেষ করে বর্তমানে আমরা যে ব্যক্তিত্বের যুগে বাস করছি সে যুগে এরূপ মানুষের উপস্থিতি প্রায় অবিশ্বাস্য বলে পরিগণিত হতে চলেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় নবজাগরণের দিনে এরূপ

মানুষের আবির্ভাব বিস্ময়কর ছিল না—বরং তা যেন অনেকটা প্রত্যাশিতই ছিল। সে যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে নতুন করে মাতৃভূমিকে ও তার জীবনাদর্শকে বোঝার প্রয়াস করেছিলেন—চেষ্টা করেছিলেন ভারতীয় জীবনাদর্শে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে। ভারতীয় জীবনাদর্শের সেই মূল কথা কি ? সেই মূল কথা পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন—মনুষ্যচরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পাই, দেখতে পাই জগদীশচন্দ্রের মধ্যেও। তাই একজন কবি হয়েও ভাবলোকে সতত বিচরণ করা সত্বেও বাস্তব জীবন ও তার সমস্যাকে মুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি আর একজন জডবস্তুর মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণে আত্মনিয়োগ করেও ভোলেন নি দেশের সাহিত্য ও শিল্পকলাকে। তাঁর চরিত্রে শিল্পানুরাগ যে পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল তার প্রমাণ আজও ছড়িয়ে আছে তাঁর বাসভবন ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সর্বত্র।

যৌবনে জগদীশচন্দ্র যখন বনচাঁড়াল ও লজ্জাবতী লতা নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিরত ছিলেন তখন বাংলার সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও চলেছিল নতুন বৈপ্লবিক আন্দোলন। বলা বাহুল্য এই উভয় আন্দোলনেরই স্নায়ুকেন্দ্র ছিল ঠাকুর বাড়ি। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এই ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ঐকান্তিক যোগাযোগ ঘটেছিল জীবনের প্রথম থেকে এবং বলা বাহুল্য সে যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত ছিল সমান অক্ষুণ্ণ। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর "On the Edges of Time" বলে ইংরেজীতে স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঠাকুর বাড়ীতে 'খামখেয়ালী সভা' নামে যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল তার অন্যতম উৎসাহী সদস্য ছিলেন জগদীশচন্দ্র।

আজকের দিনে আমাদের সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে যেরূপ বিভেদ দেখা দিয়েছে তার ফলে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি সংস্কৃতি-কর্মীদের মধ্যে মিল নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যিকরা যদি কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন সেখানে শিল্পীদের দেখা পাওয়া যায় না, শিল্পীদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে খুঁজে পাওয়া যায় না সাহিত্যিকদের। বর্তমান যুগে হলে জগদীশচন্দ্র 'খামখেয়ালী সভা'র মত কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় জাগে। সৌভাগ্যের বিষয় শিল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ ভিন জাতের। শিল্পকর্মের মাধ্যম যাই হোক না কেন তিনি সকল প্রকার শিল্পকর্মের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। তাই তিনি 'খামখেয়ালা সভা'র মাধ্যমে সে যুগের সর্বপ্রকার সংস্কৃতিকর্মীর এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এই 'খামখেয়ালী সভা'র সদস্যগোষ্ঠীতে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা, সংগীতজ্ঞ প্রভৃতি। জগদীশচন্দ্রও ছিলেন এই গোষ্ঠীর একজন সম্মানিত সদস্য এবং তিনি এ সভার আলাপ আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মুখে 'এসো এসো ফিরে এসো' নামক গানটী বারবার শুনেও পরিতৃপ্ত হোতেন না। সুযোগ পেলেই তিনি কবির মুখ থেকে এ গানটি শুনতে চাইতেন। জাতীয় শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রের যে প্রীতি তা এইভাবে ঠাকুর পরিবারের মাধ্যমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে ঠাকুর পরিবারের অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের দান সর্বজনবিদিত। এঁরা এবং আচার্য নন্দলাল বসু প্রমুখ এঁদের শিষ্যরা ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে যে প্রয়াস করেছিলেন জগদীশচন্দ্র তার সঙ্গে প্রথমাবধি পরিচিত ছিলেন। এই শিল্পী-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সৌহার্দ্যও সৃষ্টি হয়েছিল। এই সৌহার্দ্য পরবর্তী যুগে আরও দৃঢ় হয়েছিল 'বিচিত্রা' ক্লাবের মাধ্যমে। 'বিচিত্রা'র সৃষ্টি হয়েছিল

১৯১০ সালে এবং এর পিছনেও প্রধান প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রনাথের। 'বিচিত্রা'র সদস্য গোষ্ঠীভূক্ত ছিলেন শিল্পী, কবি, স্যহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর সংস্কৃতিকর্মী। ই, বি, হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের যোগাযোগ এবং প্রায় সেই সময়েই সমকালীন শিল্পী-গোষ্ঠীর উপর সুপ্রসিদ্ধ জাপানী পণ্ডিত কাউণ্ট কাকুজো ওকাকুরার প্রভাব থেকেই জন্ম নিয়েছিল নতুন ভারতীয় শিল্পকলা। কাউণ্ট ওকাকুরার "Ideals of the East" নামক গ্রন্থ সে সময়ে বাঙ্গালী বুদ্ধিজাবী সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তাব বিস্তার করেছিল এবং ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির পুনরুজীবনে প্রভূত সহায়তা করেছিল। কাউণ্ট ওকাকুরা এতেই সন্তুষ্ট থাকেন নি। ভারতীয় শিল্পীদের পথ নির্দেশে সহায়তা করার উদ্দেশ্য তিনি জাপান থেকে দুজন খ্যাতনামা শিল্পীকেও নিয়ে এসেছিলেন কলিকাতায়। ভারতীয় শিল্পের এই নব আন্দোলন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছিল 'বিচিত্রা'কে কেন্দ্র করে। বলা বাহুল্য যে বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র এই নতুন শিল্প-গোষ্ঠীকে অন্তরঙ্গভাবেই জানতেন এবং তাঁদের প্রয়াসের পিছনে ছিল তাঁর পূর্ণ সমর্থম। এই শিল্পানুরাগের পরিচয় জগদীশচন্দ্র রেখে গেছেন তাঁর স্বনির্মিত বাসভবন ও বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের সর্বত্র।

আজীবন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক হয়েও জগদীশচন্দ্র তাঁর সৌন্দর্য বোধ ও শিল্পানুরাগকে স্তিমিত হতে দেননি। তার প্রথম পরিচয় মেলে তাঁর নিজের বাসভবনে। ভারতীয় শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর যে অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, তার পরিচয় বাস-গৃহের গঠনরীতির মধ্যে তো পাওয়া যায়ই, গৃহের সাজসজ্জা ও দেওয়ালচিত্রের মধ্যেও সুস্পষ্ট। বাসগৃহে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ে বাড়ির সম্মুখে কালো পাথরে তৈরী কৃত্রিম পাহাড় এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটি নদী। সেই ছোট নদীর উপর পারাপারের জন্যে একটি ছোট বাঁশের সেতুও আছে। এই পাহাড় এবং নদী জগদীশ-চন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এ দৃশ্য দেখলে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়

'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র অবিস্মরণীয় লেখককে ঃ 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ' ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই, 'মহাদেবের জটা হইতে!' এই কৃত্রিম পাহাড় ও নদী অজন্তা গুহা-মন্দিরের চিত্রের অনুকরণে তৈরী করানো হয়েছিল। কৃত্রিম নদীটির ওপারে সংরক্ষিত আছে জগদীশচন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত একাধিক দুষ্প্রাপ্য মূর্তি। একটি মূর্তি বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীতে প্রাপ্ত—সূর্য দেবের মূর্তি—সম্ভাব্য নির্মাণকাল দশম থেকে একাদশ শতাব্দী। আর একটি মূর্তি আছে ভূমি-স্পর্শ মুদ্রায় শিরহীন উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের—সম্ভাব্য নির্মাণকাল একাদশ শতাব্দী। জগদীশচন্দ্রের বাসভবনে ঢুকলে প্রথমেই পাওয়া যায় তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানা যেখানে বসে তিনি দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। শিল্পকলার প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগের ছাপ নিয়ে এ বৈঠক-খানাটির উত্তর দেওয়ালে আঁকা আছে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের মাতৃমূর্তি বা ভারতজননীর চিত্র—তাঁর চার হাতে খাদ্য, বস্ত্র, বিদ্যা ও ধর্মের প্রতীক। ঘরটির চারদিকে ছাদ ও দেয়ালের সংযোগ স্থলে সেগুন কাঠের উপর আঁকা শিল্পী নন্দলালের মহাভারতের কাহিনী এবং অজন্তার গুহাচিত্রের অনুকরণে বুদ্ধদেবের জীবনের কাহিনী। মহাভারতের কাহিনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মানব জীবনের সেই চিরন্তন সমস্যা—জাবনের সংগ্রাম ও শান্তি। একদিকে দেখা যায় কুরু পাণ্ডবের দ্যূতক্রীড়ার দৃশ্য—তার একপাশে বাজি হিসাবে রাখা আছে রাজমুকুট আর অন্য পার্শ্বে যুদ্ধায়োজন এবং অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ প্রচারের দৃশ্য 'ক্লৈব্যং মাস্ম-গমঃ পার্থ'। দেওয়ালের আর একদিকে দেখানো হয়েছে যুদ্ধশেষের অবস্থা—বিজয়ী পাণ্ডব ভ্রাতারা গালে হাত দিয়ে বিমর্ষচিত্তে বসে আছেন, এক পাশে চলেছে বিজয়োৎসব আবার তারই পাশে শ্মশানের ভয়াবহ দৃশ্য, বিধবা নারীদের করুণ আর্তনাদের চিত্র। পশুপাখীর চিত্রের মাধ্যমে এই জীবন সংগ্রামের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে—আছে

ষাঁড়ের লড়াই, হাতির লড়াই, পাখীদের প্রভাত কুজন ও সন্ধ্যাবেলায় কুলায়ে প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য। একদিকে দেখানো হয়েছে পাখিদের জলকেলিতে উদ্বেল একটি জলাশয়ের দৃশ্য এবং অপরদিকে রয়েছে প্রস্ফুটিত পদ্মে পরিপূর্ণ শান্ত জলাশয়ের একটি চিত্র। জীবনের সমস্ত সংগ্রামের শেষ কথা এই অখণ্ড শান্তি। শিল্পাচার্য নন্দলালের তুলিতে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনাদর্শই যেন ফুটে উঠেছে তাঁর বৈঠক-খানার দেওয়ালের গায়ে। ভিতরে কত বড় শিল্পানুরাগ থাকলে নিজের বৈঠকখানাকে এভাবে ইঙ্গিতময় শিল্পকলা দিয়ে সাজানো যায় —সেকথা সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়াও বৈঠকখানার দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো আছে প্রসিদ্ধ শিল্পীদের আঁকা কয়েকখানি চিত্র। এই চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অবনীন্দ্রনাথের আঁকা রবীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলির মধ্যে একটি হল মন্দিরের পথে তীর্থযাত্রীদের যাত্রার দৃশ্য, একটিতে বালেক জগদীশচন্দ্রকে ডাল হাতে ছোটাছুটি করতে দেখা যায় এবং অপরটিতে দেখা যায় বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র নিজের উদ্ভাবিত প্রসিদ্ধ ক্রেসক্রোগ্রাফ যন্ত্র নিয়ে কর্মরত। বৈঠকখানায় জগদাশচন্দ্রের শিল্পানুরাগের নিদর্শন স্বরূপ আরও আছে ত্রিপুরার মহারাজ কর্তৃক উপহার হিসাবে প্রদত্ত সুন্দর একটি পাটির কাজ। তাতে মন্দির প্রভৃতির দৃশ্য সুন্দরভাবে অঙ্কিত; কাঠের উপর সোনালী রঙে আঁকা একটি চৈনিক বা ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্তিও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালো রঙের দুটি হাতির উপরে একটি কাঠের বসার আসনও গৃহস্বামীর সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পানুরাগের পরিচয় দেয়। লেডী অবলা বসুর লেখার ঘরে রক্ষিত আছে শিল্পী অতুল বসুর আঁকা জগদীশচন্দ্রের একটি বড় তৈলচিত্র। বারান্দায় যেখানে জগদীশচন্দ্রের চা পানের আসর বসত সেখানে রাখা আছে বহু রকমের বুদ্ধমূর্তি—ধ্যানী বুদ্ধ, উপবিষ্ট বুদ্ধ, গান্ধার স্কুলের বুদ্ধ প্রভৃতি। এছাড়া আছে মোগল ও রাজপুত যুগের বহু চিত্র। ভারতের সুপ্রাচীন শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি বিজ্ঞানাচার্য

জগদীশচন্দ্রের কি পরিমাণ অনুরাগ ছিল এসব কি তারই নিঃসংশয় প্রমাণ নয় ?

নিজস্ব বাসভবনের সংলগ্ন জমিতে নিজের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণ করেছিলেন ১৯১৭ সালে, সেখানে গেলেও আমরা এই একই দৃশ্য দেখতে পাই। ইচ্ছা করলে তিনি এটিকে আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মাণ করাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করান নি—যেমন তিনি এর নাম গবেষণাগারও দেননি। তিনি এ গৃহের নামকরণ করেছেন 'বিজ্ঞান মন্দির' এবং মন্দির নির্মাণে মানুষ যেমন সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পরুচির পরিচয় দেয় তারই পরিচয় তিনি দিয়েছেন। নিছক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যে গৃহ নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে কোন কারুকার্য না থাকলে কারও কিছু বলার থাকত না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের শিল্পী-মন শুধু প্রয়োজনের নিয়ম মেনে চলত না। এই বিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যেও তিনি তাঁর শিল্পানুরাগের পরিচয় রেখে যেতে চেয়েছেন। যাঁরা এখানে কাজ করবেন, তাঁরা যাতে সুন্দর পরিবেশে শান্তচিত্তে কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন তাই বোধ হয় ছিল তাঁর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়। ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রতি জগদীশচন্দ্রের যে অনুরাগ ছিল তার জীবন্ত নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পরিকল্পিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দির। তিনি স্থির করেছিলেন যে ভারতীয় স্থাপত্য রীতি অনুসারেই বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গৃহটি নির্মাণ করবেন। এই কাজে তিনি সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন নিজের মামাতো ভাই শ্রীঅবনীনাথ মিত্রকে। শ্রীমিত্র তার কিছুকাল পূর্বে জাপান থেকে ফিরে এসেছিলেন শিল্প-কলা ও বিস্কুট নির্মাণ বিদ্যা শিখে। শ্রীমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে জগদীশচন্দ্র ১৯১৭ সালের সুরুতে সারনাথে যান। উদ্দেশ্য সেখানকার বৌদ্ধ স্থাপত্যকলা পর্যবেক্ষণ ও তদনুসারে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গৃহনির্মাণ। সেখানে কিছুদিন থেকে তিনি বৌদ্ধযুগের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি অনুধাবন করে কতকগুলি নক্সা

সংগ্রহ করেন। তারপর শ্রীমিত্রকে পাঠানো হয় চুনারে প্রস্তাবিত গৃহনির্মাণের জন্যে পাথর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। প্রয়োজনমত পাথর সংগ্রহ করে তিনি কাশীতে যান এবং সেখান থেকে গৃহনির্মাণের জন্যে কিছু দক্ষ কারিগর সংগ্রহ করে আনেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণের কার্যারম্ভ হয় এবং এই গৃহটির উদ্বোধন হয় ঐ সালেরই ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিনে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশের পথে দুদিকে দুটি কালো পাথরের ছোট স্তূপের মত বস্তু নজরে পড়ে। এগুলি সারনাথের কালো পাথরে তৈরি এবং এ দুটি আলোকসজ্জার জন্যে ব্যবহৃত হয়। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ঠিক সামনে যে সামান্য উন্মুক্ত স্থান আছে সেখানে বাঁদিকের দেওয়ালে দেখা যাবে ভগিনী নিবেদিতার একটি মূর্তি অঙ্কিত। ভগিনী নিবেদিতার প্রতি আচার্য জগদীশচন্দ্রের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। ভগিনী নিবেদিতার হাতে একটি দীপ—স্পষ্টতই এটি জ্ঞানের প্রতীক। নিচে পদ্ম পরিপূর্ণ একটি ছোট পুকুরের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার দেহভস্ম রক্ষিত আছে। এই চিত্রটি এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিল্পী দেবল। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মূল প্রবেশ-দ্বারটি তৈরী করা হয়েছে হ্যাভেলের বই-এর একটি নক্সার অনুকরণে। মূল দরজার উপর পিতলে উৎকীর্ণ হয়েছে বনচাঁড়াল ও লজ্জাবতী লতার নক্সা। এই বনচাঁড়াল ও লজ্জাবতী লতা নিয়েই জগদীশচন্দ্রের প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল। এছাড়া আছে বজ্র ও পদ্ম। পদ্ম হলো পবিত্রতা ও কোমলতার প্রতীক আর বজ্র হলো বীর্যের প্রতীক। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' এই ছিল জগদীশচন্দ্রের জীবনাদর্শ। বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের পরিকল্পনার মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর জীবনাদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছেন সকলের সম্মুখে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কারুকার্যে পবিত্রতার প্রতীক পদ্ম একটা বড় স্থান দখল করে আছে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সম্মুখভাগের শীর্ষদেশে

যে হাওয়া ঘরটি নির্মিত হয়েছে তার প্রেরণা জগদীশচন্দ্র পেয়েছিলেন কাশীর প্রসিদ্ধ মানমন্দির থেকে। ছাদের উপরে আছে পিতলের তৈরী বজ্র। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ পথের মাঝামাঝি জায়গায় আছে একটি কাঠের কাশ্মীরী গেট। এটি জগদীশচন্দ্র উপহার পেয়েছিলেন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে। ডানদিকের একটি দরজা জগদীশচন্দ্রের নির্দেশে দার্জিলিংএর বৌদ্ধ গুম্ফার অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছিল। বিজ্ঞান-মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের রূপসজ্জা ও পাথরের খোদাই-র কাজ করা হয়েছে সারনাথে প্রাপ্ত নক্সা অনুসারে। কোথাও কারুকার্যের আতিশয্য নেই অথচ কারুকার্য যেটুকু আছে তা সুন্দর ও অর্থবহ।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করলে প্রথমেই পাওয়া যায় একটি ছোট হলঘর। তার উত্তর প্রান্তে রাখা আছে ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তৈরি জগদীশচন্দ্রের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি। মূর্তিটি দেবীপ্রসাদ তৈরি করেছিলেন ১৯৩২ সালে। এই ছোট হল ঘর দিয়েই প্রবেশ করতে হয় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রসিদ্ধ বক্তৃতা কক্ষে। বক্তৃতা কক্ষটির বৈশিষ্ট্য হল এর রূপসজ্জা। এখানেও জগদীশচন্দ্রের সেই স্বাভাবিক শিল্পানুরাগের পরিচয় স্পষ্ট। কাঠের বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখ ভাগে আছে সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেবের চিত্র। অজন্তা গুহাচিত্রের অনুকরণে এই চিত্রটি করেছিলেন আচার্য নন্দলাল। সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেবের দ্বাদশ শিখার প্রতীক হিসাবে আছে দ্বাদশ মূর্তি—আলো এবং অন্ধকারের প্রতীক হিসাবে আছে দুটি মূর্তি। মঞ্চের পিছনে দেওয়ালের উপরে আছে আচার্য নন্দলালের পুরুষ ও নারীর আর একটি বিরাট চিত্র। পুরুষের হাতে নগ্ন তরবারি—সে ছুটে চলেছে সত্যের সন্ধানে আর পিছনে চলেছে নারী বাঁশি হাতে—কল্পনা ও প্রেরণা জোগাতে। তাদের পিছনে পড়ে আছে পদচিহ্ন—যে পদচিহ্ন অনুসরণ করবে পরবর্তী যুগের লোকেরা। মঞ্চের উপরে যে ছাত সেখানেও অজন্তা গুহাচিত্রের ধরণে রূপসজ্জা করা হয়েছে। আচার্য পরিকল্পিত বিজ্ঞান-মন্দিরের রূপসজ্জার যে পরিচয় দেওয়া হল এর পরও কি একথা বলার অপেক্ষা রাখে যে তাঁর চরিত্রে শিল্পানুরাগ ছিল একান্ত সহজাত এবং স্বাভাবিক ?

॥ আধুনিক বাঙলা কবিতার ক্রম-বিবতন ॥

ক্রম-বিবর্তন জীবজগতের অনতিক্রমণীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মানুসারে মানব-সভ্যতা নিরন্তর ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে; এই ক্রমোন্নতির পথে বাধা-বিপত্তির অবশ্য অন্ত নেই—যুদ্ধ আছে, মহামারী আছে, আছে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংস। তবু এই বাধাবিপত্তিকে এড়িয়ে ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলার মত প্রাণশক্তি মানব-সভ্যতার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মানব-সভ্যতার বিচার যাঁরা করেন, তাঁরাই এ কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ইতিহাসে এমন দুর্দৈবের সন্ধান মেলে যার ফলে মানব-জীবনে একটা বিষম ওলট-পালট হয়ে গেছে; তবু মানব-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচায়ক সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতির যে ক্রমোন্নতি হচ্ছে একথা অনস্বীকার্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে মানব-সভ্যতা নীহারিকারই মত অস্পষ্ট; তার নিজস্ব কোন রূপ নেই। সভ্যতা সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতির সমষ্টি ছাড়া আর কি? তাই এদের একটির উন্নতি অপরটির উন্নতি সূচিত তো করবেই।

ঈশ্বর গুপ্তের পর থেকে আজ পর্যন্ত বাঙলা কবিতায় যে প্রচুর বিবর্তন হয়েছে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। এই আশী বছরের মধ্যে বাঙলা কবিতার এমন রূপান্তর হয়েছে যার ফলে বাঙলা কবিতা আজ ভৌগোলিক সংকীর্ণ সীমা-রেখাকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের কবিতার সমপর্যায়ে উঠেছে। এই অগ্রগতির মূলে বাঙালী বহু কবির কৃতিত্ব থাকিলেও, একজন কবির কৃতিত্ব সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে। তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বর্তমান বাঙলা কবিতার বহুধা বিচিত্র প্রকাশ তাঁর কাছে যে কত ভাবে ঋণী—সে কথা বলে শেষ করা যায় না। কোন্

ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের নিয়মানুসারে বাঙলা কবিতার এই বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভব হয়েছে, সেই কথাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে নানা কারণে উনবিংশ শতাব্দী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই এই শতাব্দীতে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা চূড়ান্ত উন্নতি লাভ করেছিল : এ শতাব্দীকে বলা চলে ধনতান্ত্রিকতার স্বর্ণযুগ। এই শতব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতির ফলে, যন্ত্র-শিল্পের প্রবর্তনের ফলে মানব-সমাজে এমন একটা আলোড়ন এসেছিল ইতিহাসে যার জুড়ি মেলে না। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল মানুষের দাসত্বের উপর—এই দাসত্বের উচ্ছেদ সাধন করে ধনতন্ত্র পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। মধ্যযুগের দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সবই ছিল ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, সামন্ততন্ত্র মানুষকে ধর্মের অহিফেন সেবন করিয়ে নিজের আসন কায়েমী করবার চেষ্টা করেছিল। মানুষকে তার নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে এক মুহূর্তের জন্যও সজাগ হতে দেয়নি। তাই সে যুগের সাহিত্যে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খার প্রতীক, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক গীতি কবিতার অভাব সুস্পষ্ট। তখনকার কবিতা হয় ধর্মমূলক—নয়ত মহাকাব্য। এদের একটিতে অলৌকিক দেব-দেবীর গুণকীর্তন—অপরটিতে দেবদেবীরই মত শক্তিশালী সমাজের শাসকশ্রেণীর জীবনযাত্রার প্রতিফলন। সামন্ততন্ত্রের অধীন সমাজ-ব্যবস্থায় কবিদের আর উপায়ান্তর ছিল না। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে একটা জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় ; সেটা এই—ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক—সাহিত্য প্রায় ক্ষেত্রেই শাসকশ্রেণীর অনুবর্তন করে। শাসক শ্রেণীর আশা আকাঙ্খাই সমাজের বৃহত্তর অংশের আশা আকাঙ্খা হয়ে দাঁড়ায় এবং সাধারণত এই শ্রেণীর জীবনযাত্রা এবং

চিন্তা ধারাই সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়। একদিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্যের যে শ্রেণী বিভাগ আছে, সাহিত্য যে সমাজ-নিরপেক্ষ নয়, সেকথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ক্রমে ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিকতার মৃত্যু হল ; তার স্থানে দেখা দিল নতুন বিপ্লবী শক্তি ধনতন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের মত ধনতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য শোষণ ; তবু ধনতন্ত্রের অধীনে মানুষের স্বাধীনতা অনেক বেড়ে গেল। ক্ষেত্রদাস প্রথাপ্রভৃতি মধ্যযুগীয় অনেক কুপ্রথার উচ্ছেদ হল—মানুষের জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানব-জীবন থেকে ধর্মের প্রভাব অনেক কমে গেল—তার স্থানে দেখা দিল অপরিমেয় জ্ঞানস্পৃহা—অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার দুর্দম স্পৃহা। এই স্পৃহারই প্রতিফলন দেখি আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুখর রোমান্টিক কবিতায়। এই রোমান্টিসিজম ভিন্ন ভিন্ন কবির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছিল। তবে এক বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক কবিরই সাদৃশ্য ছিল—সেটা হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা। অনাসক্ত বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে এঁরা বস্তু-জগতের দিকে তাকান নি ঃ এঁদের কাব্যে বস্তু-জগতের যে রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে বস্তুগত সত্যের চেয়ে কবির আত্ম-কামনারই ছাপ দেখা যায় বেশী। ইংলণ্ডের শেলী, কীটস্, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ প্রভৃতি সব রোমান্টিক কবির কবিতায়ই এ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতির ফলে কোন কোন কবির মধ্যে আবার সীমাহীন আশা-আকাঙ্খা দেখা দিয়েছিল ; ভাবী যুগের অগ্র-গামী স্বপ্নে তাই এঁদের কবিতা অনেক সময় মুখর। শেলীর Prometheus Unbound নামক গীতি-নাটকে কবির মনের এই দিকটার সন্ধান মেলে। টেনিসনও ভবিষ্যতে স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে গেছেন ; কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এঁদের এই স্বপ্ন নিছক কল্পনাই ছিল—কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তার ছিল না। রোমান্টিক কবির স্বাভাবিক আবেগ-প্রবণতার থেকেই এ স্বপ্নের সৃষ্টি হয়েছিল। কোন

কোন কবি আবার যন্ত্রযুগের নতুন জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি ; বাস্তবকে উপেক্ষা করে তাঁদের সৃষ্টি তাই অগ্রগামিতায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি—হয়েছে পশ্চাদ-গামী। তাঁদের অতীতাশ্রয়ী পালায়নবাদী কবি-কল্পনা বাস্তবকে উপেক্ষা করে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে চেয়েছিল। অগ্রগতির পথে এঁদের প্রভাব যে প্রতিক্রিয়াশীল ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যাক, এবার বাঙলা কবিতার আলোচনায় ফিরে আসা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যে রোমান্টিসিজমের যে যে লক্ষণ পরিস্ফুট, তার সবগুলো ধীরে ধীরে বাঙলা কাব্যে দেখা দিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। মানবসমাজের ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সব দেশে মানব-সমাজ একই পথে বিবর্তিত হয়েছে। দেশগত ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক কারণে এই বিবর্তনের কোথাও সামান্য বিভিন্নতা দেখা গেলেও এর মূল সুর একই। ঐতিহাসিক জড়বাদের দৃষ্টিতে দেখলে এই বিবর্তনের মধ্যে বিভিন্নতার চেয়ে সাদৃশ্যই দেখা যায় বেশী। সেই ক্ষেত্রদাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ; একই পথে সর্বত্র সমাজ-বিবর্তন হয়ে এসেছে। মানবসভ্যতার প্রথম দিকে বিচারের চেয়ে বিশ্বাসই প্রবল ছিল বেশী ; তাই প্রাচীনকালে প্রত্যেক জাতির মধ্যে ধর্মপ্রবণতারই প্রতিফলন দেখি আমরা সে জাতির সাহিত্য, সমাজ, দর্শন প্রভৃতিতে। মানব-সভ্যতা যতই অগ্রসর হয়, ততই ধর্মপ্রবণতার স্থানে দেখা দেয় যুক্তি ও বিচারবোধ। বাঙালী সমাজ ও বাঙালীর সাহিত্যও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলা কবিতায় আমরা দেখি ধর্মের নিরবচ্ছিন্ন অপ্রতিহত প্রভাব। প্রাচীন বাঙলা কাব্য বলতে আমরা ধর্মমূলক কাব্যই বুঝি—সে মঙ্গল কাব্যই হোক আর বৈষ্ণব কবিতাই হোক। এদের মধ্যে ধর্মের প্রকার ভেদ হয়ত আছে কিন্তু মূল ঠিক আছে। মানুষের চেয়ে দেবদেবীর প্রাধান্যই প্রাচীন বাঙলা কাব্যে বেশী। সামন্ততান্ত্রিকতার

অধীনে কবিদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ছিল না বলে তাঁদের কাব্যে মানুষের অর্থনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় চিন্তা স্থান পায়নি। আর তা ছাড়া ধর্মই ছিল সে যুগের মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় সমস্যা। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়-কাহিনীতেও দেবী-দেবীর গুণ-কীর্তনের অভাব নেই। এই ধর্মাচ্ছন্নতা বহুদিন ধরে বাঙলা কবিতাকে মুহ্যমান করে রেখেছিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিক এসে আমাদের দেশে রাজ্য স্থাপন করেছিল বটে—তবে তার ফলে আমাদের রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থায় খুব বেশী পরিবর্তন আসে নি; মধ্যযুগীয় সামন্ত-তন্ত্রের আসন পূর্বের মতই অটল ছিল। তবে উনিশ শতকের শেষ-ভাগে এই সামন্ততন্ত্রের গায়ে হঠাৎ এসে আঘাত দিল ধনতন্ত্র। পাশ্চাত্য জগতে ধনতন্ত্রের শুরু হয়েছিল বহুদিন—তবে ধনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পরিণতি আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল এবং নানা প্রকার সামাজিক বিপ্লবও সেখানে দেখা গিয়েছিল। আমাদের দেশে ধনতন্ত্রের আগমন কিন্তু বিলম্বিত এবং তার স্বাভাবিক বিপ্লবের মূর্তি নিয়েও এখানে সে দেখা দেয়নি। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী শাসকের মধ্যস্থতায় ধনতন্ত্র আমাদের দেশে এসেছিল। তার স্তিমিত প্রকাশে আমাদের রক্ষণ-শীল সামাজিক জীবনে খুব বেশী এককালীন উপপ্লব দেখা দেয়নি। স্থিতাবস্থাকে উপক্রুত না করে ধীরে ধীরে ধনতন্ত্র এখানে তার শক্তি বিস্তার করেছিল। আমাদের দেশে ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল বলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে আমাদের সমাজ-জীবনে তার পরিপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা কবিতাও তাই পরিবর্তনশীলতায় অস্থির। ইতিমধ্যে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের ফলে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজী কবিতার সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে বাঙালী কবিরা ভাবছিলেন কি করে ধর্মের

পথ থেকে কবিতার মোড় ফেরানো যায়। এই মোড় ফেরানোর প্রথম প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। কিছু পরিমাণে ধর্মের প্রভাব মুক্ত হলেও বাঙলা কবিতাকে নিত্য নতুন সৃষ্টির পথে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত প্রতিভা ও শক্তি ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না। এঁর পরেই আবির্ভাব হল মাইকেল মধুসূদন দত্তের। ইংরেজী ছাড়াও ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি আরও কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কবিতায় হোমার, ভার্জিল, মিল্টন প্রভৃতি মহাকবির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাঁর 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য রচনায় মিল্টনের Paradise Lost যে যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গীতি-কবিতার দিকে মাইকেলের ততটা প্রবণতা না থাকলেও তিনি চতুর্দশপদী প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী কাব্যরূপ বাঙালা ভাষায় আমদানী করেছিলেন। তাঁর এই বিপ্লবের ফলে বাঙলা কবিতা যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেকথা নিঃসন্দেহ। তবে প্রধানত মধুসূদনের "মেঘনাদ বধের" সাফল্যে এই সময় বাঙলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার একটা ধুম পড়ে গেল। উদারণস্বরূপ এখানে হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। বাঙলা সাহিত্যে গীতি-কবিতার দিকটা এ সময়ে অনাদৃত ছিল বললেই হয়। ইত্যবসরে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ-জীবনে ধনতন্ত্র তার শিকড় চালিয়েছিল। তার ফলে জন্ম হয়েছিল মধ্যবিত্ত সমাজের এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের। যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সমাজ-জীবনে রূপান্তর নিয়ে আসছিল। সদ্যোজাগ্রত মধ্যবিত্ত সমাজ আর মহাকাব্যে সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার আধার গীতি-কবিতার আদর দিন দিন বেড়ে চলেছিল। এই যুগের গীতি-কবিতাকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যই জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিমধ্যেই কত গীতি-কবি যে জন্মেছিলেন তার সংখ্যা নেই। উদাহরণ স্বরূপ একই নিঃশ্বাসে

শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ, ব্রাউনিং, টেনিসন, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ছিলেন আমাদের সাহিত্যে মাত্র একা রবীন্দ্রনাথ ; অবশ্য তাঁর অনন্যসাধারণ কবি প্রতিভা ও সৃষ্টি ক্ষমতার গুণে তিনি একাই একশ ছিলেন। প্রগতিশীল ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ; তবে তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন বলে ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু রূপও তিনি স্বচক্ষে দেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-দর্শন ও জীবন-দর্শনের বিচার করলে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে হতবাক হয়ে যেতে হয়। তিনি যে প্রধানত আদর্শবাদী কবি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই ঃ প্রাচ্যের ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিতেই তাঁর কবি-মানস গড়ে উঠেছিল। এই ভাববাদী দর্শনের উপর ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রলেপ। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ মননশীলতা ও কবি-কল্পনা যে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তারই বহুধা বিচিত্র প্রকাশ দেখি আমরা তাঁর বিভিন্ন রকমের কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বৈচিত্র্য যথেষ্ট থাকলেও, তার মূল সুর একই। তিনি মনে-প্রাণে আদর্শবাদী—আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তবে প্রাচ্য ভাববাদী দর্শনের সাথে তিনি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন—সেটা সত্যই বিস্ময়কর। বহু কবির, বহু দার্শনিকের প্রভাবকে তিনি আয়ত্ত করে নিজস্ব প্রতিভার রঙে রাঙিয়ে নিতে পেরেছিলেন। প্রাচ্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে অটল বিশ্বাস থাকা সত্বেও তিনি পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কখনও অস্বীকার করেন নি। কৃষিজীবী যুগের কবি কালিদাসের প্রভাব তাঁর মধ্যে যেমন আছে, তেমনি আছে ধন-তান্ত্রিক যুগের ইংরেজ কবি ব্রাউনিংয়ের প্রভাব। বড় প্রতিভা মাত্রই যে সমন্বয়-ক্ষমতায় অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের প্রকৃতি-পূজা, শেলীর নৈর্ব্যক্তিকতা, কীটসের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য

সৌন্দর্য-বোধ, ম্যাথু আর্নল্ডের শৈল্পিক সংযম, টেনিসনের কাব্যিক মধুরতা—এর সব কিছুরই স্পর্শ পাই রবীন্দ্র-কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর প্রথম ত্রিশ বৎসর বাংলা কাব্য তাঁরই সর্বব্যাপী প্রভাবে মুহ্যমান হয়ে রইল। তাঁর প্রদর্শিত পথে অনেক অনুবর্তী এগিয়ে এলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী বাঙলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করে তুললেন। মধুসূদনের যুগের মিল্টন প্রভাবান্বিত বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ যেন মায়ামন্ত্রের বলে সমসাময়িক ইংরেজী কবিতার পর্যায়ে টেনে তুললেন। রবীন্দ্রকাব্যের আবেদন ও প্রসার তাই এত ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে দুই শ' বৎসরের মধ্যে বাঙলা কবিতার যে উন্নতি সম্ভব হয়নি, তাঁর আবির্ভাবের পরে মাত্র ত্রিশবৎসরে সে উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বাঙলা কবিতা তার স্বভাবসুলভ রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে ভৌগোলিকতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যদের হাতে বাঙলা রোমান্টিক কবিতা চরম উন্নতি লাভ করেছিল; রোমান্টিসিজমের কোন দিকই এঁরা অনাবিষ্কৃত রাখেন নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সংক্ষেপে এই হল বাঙলা কবিতার ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। মহাসমরের পরেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর অজস্র দানে বাঙলা কবিতাকে পরিপুষ্ট করে-ছিলেন। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথ এবং প্রথম মহা-সমরোত্তর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বেশ কিছুটা প্রভেদ দেখা যায়। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে তাঁর কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ায় ভ্রমণের ফলে তিনি যে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিলেন—তা তাঁর রচিত পরবর্তী কবিতাগুলো পড়লেই বেশ বোঝা যায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় তিনি দেখে এসেছিলেন—দেখেছিলেন জনগণের অভূতপূর্ব জাগরণ, দেখেছিলেন মার্ক্সীয় ঐতি-হাসিক জড়বাদের আওতায় তাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শনে এক অভিনব

বিপ্লব। তাই জীবনের শেষের দিকে জনগণের সঙ্গে একাত্মীভূত হবার বাসনা তাঁর অন্তরে প্রবল ভাবে জেগেছিল—তাঁর শেষ-জীবনে রচিত বহু কবিতায়ই আমরা এ মনোভাবের সন্ধান পাই। তবে মার্ক্সীয় জড়-বাদী শিল্প-দর্শনকে তিনি একান্তভাবে গ্রহণ করতে পারেননি—আর সেটা না পারাও স্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম আধ্যাত্মিকতা ও প্রাচ্য দর্শনের আদর্শবাদ তাঁর রক্ত-মজ্জায় মিশে ছিল। তাঁর মনে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী নাস্তিক জড়বাদী দর্শনের স্থান হওয়া পুরোপুরি কি সম্ভব? তবে তিনি চিরকালই উদারনৈতিক ও স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন—রক্ষণশীলতা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই পরিবর্তন-শীলতাকে তিনি কোনদিনই ঘৃণার চক্ষে দেখতেন না—মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজে কত নিত্য নূতন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে গেছেন। স্থিতিশীলতার সঙ্গে গতিশীলতার এই অপূর্ব সংমিশ্রণই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র-কাব্য শুধু অতীত বা বর্তমানের কাব্য নয়—ভবিষ্যতের দিকেও তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

এইবার আমরা সমরোত্তর বাঙলা কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির যে প্রয়াস হ'য়েছে এবং এখনও হচ্ছে তাই নিয়ে আলোচনা করব। 'কল্লোলে'র যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক কবি নানাভাবে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির প্রয়াস পেয়েছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তর বিভাগ আছে—তবে মোটামুটি হুটো স্তরই প্রধান। এর প্রথম স্তর শুরু হয়েছিল 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে আর তার কয়েক বছর পরেই এ আন্দোলন নিঃশেষিত হয়েছিল। এ কাব্যিক আন্দোলনের সার্থকতা হয়ত ছিল, কিন্তু এর পিছনে কোন বিশেষ আদর্শ-বোধ ও সজ্যশক্তি না থাকায় অতি শীঘ্রই এর অকালমৃত্যু সম্ভব হ'য়েছিল। দ্বিতীয় স্তরের রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির আন্দোলন এখনও চলছে—এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আধুনিক কবিদের চোখে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ-পূর্ব পৃথিবীর প্রভেদ যে

খুব ভাল করে ধরা পড়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে যে গোঁজামিল ও শোষণ-পদ্ধতি লুকিয়ে ছিল—তার মুখোস খুলে গিয়ে ধনতন্ত্রের আসল রূপ ধরা প'ড়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিকতার সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্র প্রত্যেক দেশেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল এবং অনাগত নতুন যুগের কথা শোনানোর চেষ্টা করছিল। এর ফলে সমাজ-দেহে একটা প্রবল বিক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। ধন-তান্ত্রিকতার অসুস্থ আহাওয়ায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আর স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। ইংলণ্ডের সমাজদেহে যে বিক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, তারই প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখি আমরা টি, এস্, এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড (Waste Land) নামক কাব্য গ্রন্থে। ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এমন চমৎকার চিত্র আর হয় না। মিঃ এলিয়ট যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাব্য-জগতে প্রবেশ করেছিলেন, তার পরিণতি কিন্তু হয়েছে শোচনীয়। ধীরে ধীরে তাঁর বিপ্লবী মনোবৃত্তির পরিবর্তন হ'য়েছে —বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল বললেই চলে। ধনতন্ত্রের সাময়িক উন্নতিতে আশান্বিত হ'য়ে তিনি কায়েমী সমাজ-স্বার্থের পরিপোষক হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। ফলে তাঁর হাত থেকে আমরা পরে আর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'এর মত প্রথম শ্রেণীর একখানি কাব্যও পাইনি। মহাযুদ্ধের পরে আমাদের সমাজে শ্রেণীবিদ্বেষ প্রবলভাবে দেখা না দিলেও, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ হ'য়েছিলেন। আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেন আর পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তি দিতে পারছিল না ঃ তাই অনেক তরুণ কবিই রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর্‌ছিলেন। কাব্যের কোন একটা দিক যখন পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করে তখন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং হওয়া উচিতও। যুগে যুগে বিভিন্ন খাতে কাব্যের প্রবাহ প্রবাহিত না হলে—সে কাব্যকে জীবিত অ্যাখ্যা দেওয়া চলে না। পরিবর্তন

জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রথম বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বলার কিছুই নেই। তবে তাঁদের এ আন্দোলন ভুল পথে পরিচালিত হ'য়েছিল বলেই, তাঁদের উদ্দেশ্যসাধনে তাঁরা অসমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের আন্দোলনের মূলে কোন আদর্শগত বিভিন্নতা ছিল না—ছিল শুধু নূতনত্বের মোহ। নূতনত্বের মোহ কেউ অস্বীকার করে না—তবে নিছক নূতনত্বের মোহ থেকে কখনও সাহিত্যে বিপ্লব আসতে পারে না। যুদ্ধোত্তর বাঙলা কাব্যে প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অতিক্রম করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁরা গোড়াতেই ভুল করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদী জীবন-দর্শন ও কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ করতে পারেননি; তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন রচনা-রীতির বিরুদ্ধে। তাঁদের বিপ্লব তাই নিছক আঙ্গিক-সর্বস্বতায় পরিণত হয়েছিল। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাব-গত অনৈক্য তাই বড় কম ছিল—ছিল শুধু আঙ্গিক আর ভাষার বৈষম্য। রবীন্দ্র-জীবনাদর্শ ও কাব্যাদর্শের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব বল্‌লেই চলে। এই অসামর্থের দরুণ এঁদের মধ্যে অনেকেই সদ্যোজাত বিলিতি কবিতার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আঙ্গিক এবং ভাষার দিক থেকে এঁরা এক একজন হয়ে উঠেছিলেন বাঙালী এলিয়ট এবং পাউণ্ড্। দেশীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি এঁদের অপরিসীম ঘৃণা-বোধ এঁদের কাব্যে এবং বাক্যে সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। আবার কেউ কেউ বা রবীন্দ্রকাব্যের নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের আদর্শে দেহাত্মবাদের খাদ মিশিয়ে নিজেদের অন্তর্গূঢ় কামনা চরিতার্থ করতে লাগলেন এবং মৌলিকত্বের ছাপ মেরে তাকেই বাজারে চড়া দামে বিক্রীর চেষ্টা করতে লাগলেন। বোধ হয় এরূপ ভঙ্গী-সর্বস্ব মৌলিকত্ব-প্রয়াসী কবিকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জন্মদিনে' নামক কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতায় বলেছিলেন:

"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে।
সেটা সত্য হোক্
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নতুনত্ব-বিলাসীরা শুধু ভঙ্গী দিয়েই আমাদের ভোলানোর চেষ্টা করেছিলেন। পুরানো ভাবকে ভাষার মারপ্যাঁচে এঁরা নতুন ব'লে বাজারে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই নিরঙ্কুশ কবিরা কিছুদিন বাঙলা ভাষার উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন, সে কথা পাঠক-সমাজের আজও মনে আছে। তবে পাঠক-সমাজের ক্রমবর্ধমান অবজ্ঞার ফলে বাঙলার কাব্যজগৎ বর্তমানে অনেকটা পরিশুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। মৌলিকত্ব সম্বন্ধে মৌলিকত্বাভিমানী এই শ্রেণীর কবিদের গুরু এলিয়ট কি বলেছেন, সে কথা উধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করি: "The poem which is absolutely original is absolutely bad; it is, in the bad sense, 'subjective' with no relation to the world to which it appeals. ......I do not deny that true and spurious originality may hit the public with the same shock; indeed spurious originality ('spurious' when we use the word 'originality' properly, that is to say, within the limitations of life, and when we use the word absolutely and therefore improperly 'genuine') may give the greater shock."

আমাদের তথাকথিত বিপ্লবী কবিদের বেলায়ও তাই হয়েছিল। তাঁদের মেকী মৌলিকত্ব দেশে একটা আলোড়ন এনেছিল বটে,

তবে সুখের বিষয় সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। রবীন্দ্র-প্রভাব-অতিক্রমের নামে ভাষা এবং আঙ্গিকের অভিনবত্বে যাঁরা রবীন্দ্র-প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাঁদের ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে।

সম্প্রতি বাঙলা কাব্যে এমন কয়েকজন তরুণ কবি দেখা দিয়েছেন, যাঁদের কাব্যাদর্শ সুস্থ অথচ যথেষ্ট বিপ্লবী। তাঁরা বুঝেছেন যে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হতে হলে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও কাব্যাদর্শের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। বাঙলা কবিতায় নতুন ভাবধারা আনতে পারলে নতুন আঙ্গিক ও ভাষা আপনিই সৃষ্টি হবে। এঁরা তাই ঐতিহাসিক জড়বাদের ভিত্তিতে রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। জড়বাদী দর্শন পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নতুন—তাই নতুন কবিদের সামনে বিরোধিতাও আছে যথেষ্ট। তবে সে বিরোধিতাকে অতিক্রম করার মত প্রাণশক্তি জড়বাদী দর্শনের আছে বলেই মনে হয়। পৃথিবীর গতি যেমনভাবে মোড় ফিরছে তাতে মনে হয় যে শীঘ্র পৃথিবার বেশীর ভাগ লোক এই জড়বাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে—তখন এই নতুন সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হবে। উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী শক্তি ব'লে জড়বাদী দর্শন আজও ধন-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় অপাংক্তেয়। তবে এ ব্যবস্থা আর বেশী দিন থাকবে বলে মনে হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক-জড়বাদী কবির প্রধান উপলব্ধির বিষয়। জীবনের সমস্ত দিকই তাঁকে অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে নতুন ক'রে যাচাই ক'রে নিতে হবে। পূর্বগামী জীবন-দর্শনের সঙ্গে জড়বাদী দর্শনের যথেষ্ট বিরোধ থাকলেও, জড়বাদ কিন্তু দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে না। ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রকৃত বিপ্লবের সন্ধি একেবারে অসম্ভব নয়। ট্রট্স্কির মত বিপ্লবীও বলেছেন: "We Marxists live in traditions, and we have not stopped being

revolutionists on account of it." সাম্প্রতিক কবিরা তাই নিরঙ্কুশ নন। তাঁরা ভবিষ্যতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। মানব-সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ বলে যে-পলায়নবাদী কবিরা নৈরাশ্যে মুহ্যমান হ'য়ে পড়েন—তাঁদের প্রতি সাম্প্রতিক কবিদের কোন সহানুভূতি নেই। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় আবার বলিষ্ঠ আশাবাদের সুর ফিরে আসছে—কবিরা আজ বাস্তবকে এড়িয়ে চলতে চান না। তাঁদের কাব্যের বিষয়-বস্তু যত বেড়ে যাচ্ছে, আঙ্গিকেরও তত বিবর্তন হ'চ্ছে। এঁদের কবিতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক বাস্তব-বোধ এবং মার্জিত মননশীলতা অতি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উনবিংশ শতকীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থানে এঁদের কাব্যে দেখা দিচ্ছে গোষ্ঠীগত সমাজচেতনা। এঁদের কবিতা মনের বিলাস নয়—সামাজিক প্রয়োজন। তবে বাঙলা কাব্যে বর্তমানে পরীক্ষার যুগ চলেছে—এর পরিণতি আসবে দেরীতে। তাই সমগ্রভাবে এখনই এ যুগের বিচার করা চলে না। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন এই জড়বাদী দর্শনের ভিত্তিতেই কবিরা আদর্শবাদী রবীন্দ্র কাব্যাদর্শের হাত থেকে মুক্তি পাবেন—তখন নতুন সৃষ্টির প্রাচুর্যে বাঙলা কাব্যের আরেক গৌরবময় যুগের সূচনা হবে। মাত্র জনকয়েক তরুণ কবি এই নতুন পথে হাঁটতে শুরু করেছেন; সংখ্যাল্পতার দরুণ প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আদর্শ ভ্রষ্ট না হলে এঁরাই যে একদিন বাঙলা কবিতাকে সম্পুর্ণ মুক্তি দিতে পারবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

॥ অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা ॥

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে প্রথমেই একটু মুখবন্ধ ক'রে নেয়া ভাল। আজকাল বাংলা দেশে দুই শ্রেণীর পাঠক আছেন : একদল অতিমাত্রায় অপরিণতবুদ্ধি তরুণ আছেন যাঁরা অতি-আধুনিকতার লেবেল দেখলেই আনন্দে শিউরে' ওঠেন! বোধগম্য হোক বা না হোক্ অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা তাঁদের মতে খুব সুন্দর—নিতান্ত কুরূপা মেয়েও যেমন হৃতবুদ্ধি প্রেমিকের চোখে সুন্দর ঠিক তেমনি। ঠিক এর বিপরীত আর একদল লোক আছেন : এঁরাও অবশ্য অতি-আধুনিক কবিতার নাম শুনলেই শিউরে' ওঠেন—তবে এঁদের শিহরণ আনন্দের নয়, ভয়ের। অতি-আধুনিক সব কিছু এঁদের মতে ন্যক্কারজনক : অতি-আধুনিক কবিতাকে এঁরা ছোঁয়াচে রোগের মত পরিহার করেন। এঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের পরে আর ভাল বাংলা কবিতা রচিত হয় নি। প্রথমোক্ত অন্ধ-ভক্তের দল যেমন না পড়ে'ই বা না বুঝেই অতি-আধুনিক কবিতার প্রশংসায় মুখর, শেষোক্ত দলও তেমনি না প'ড়েই এর নিন্দায় পঞ্চমুখ। প্রথমোক্ত দলের মতে এমন জিনিস নাকি বাংলা দেশে "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি," আর শেষোক্ত দলের মতে এসব নাকি নেহাৎই পাগলের প্রলাপ—বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রের আগাছা মাত্র। বলা বাহুল্য যে এই দুই মতের কোনটাই সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়। অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা থেকেই এই মত দুটির প্রাদুর্ভাব। বর্তমান বাঙ্গালা সমাজে সুস্থমস্তিষ্ক নিরপেক্ষ পাঠক খুঁজে পাওয়া বড় মুস্কিল। প্রায় প্রত্যেকেরই বুদ্ধির তৌলযন্ত্রের ভারকেন্দ্র প্রায় স্থির থাকে না। তাই অপক্ষপাত দৃষ্টি নিয়ে অতি-আধুনিক বাংলা কবিতাকে বিচার করেন খুব কম পাঠকই। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা নিরপেক্ষ নৈর্বক্তিক দৃষ্টি

দিয়েই এ জটিল বিষয়টির বিচার করার চেষ্টা করব। একটি ছোট প্রবন্ধে এতবড় একটি জটিল বিষয়বস্তুর প্রতি সুবিচার করতে পারব ব'লে ভরসা হয় না ঃ তাই কোন বিশেষ বাঙ্গালী কবির কবিতা নিয়ে আমি বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করব না। কেবল মাত্র অতি-আধুনিক কবিতার কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং দোষগুণ নিয়েই আমি আলোচনা করব। আমরা অতি-আধুনিক যুগেই জন্মেছি এবং পৃথিবীর অতি-আধুনিক সাহিত্যরসে আমার বুদ্ধি-বৃত্তি পরিপুষ্ট। গোঁড়ামি বা অন্ধ স্তাবকতা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা বর্তমান বাংলা কবিতার মূল ভাব-স্রোত নির্ধারণই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এবিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হব—সে-বিচারের ভার পাঠক-সাধারণের হাতেই রইল।

অতি-আধুনিক বাংলা কবিতার যুগ কবে থেকে আরম্ভ হ'য়েছে তা' নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত করা সহজ নয়। কারণ সাহিত্যিক যুগ-বিভাগ ঐতিহাসিক যুগ-বিভাগের মত সুনির্দিষ্ট নয়। তবে কালের দিক থেকে প্রথম য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তির প্রয়াস যে কবিতায় আছে তাকেই আমরা অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা আখ্যা দেব। কারণ এ ছাড়া আর ভাল কোন আখ্যা দেওয়ার মত দিন আজও আসে নি। আমরা জানি যে প্রথম য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ বাহ্যিক জড়জগতের মত, মানুষের বৃহত্তর ভাব-জগতেও এনেছিল একটা প্রবল আলোড়ন যার ফলে মানুষের চেতন ও অব-চেতন মনের অনেক প্রবৃত্তিরই পুনর্মূল্য-নির্ধারণ হ'য়ে গেছে। তাই প্রাক্-সামরিক ইংরেজী কবিতা এবং সমরোত্তর ইংরেজী কবিতার মধ্যে তফাৎ অনেক। যে আশা ও ভরসা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর কবিতার জয়যাত্রা সুরু হ'য়েছিল তার মূল প্রোথিত ছিল উনবিংশ শতকের নিষ্ক্রিয় এবং নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে। ভাব-বিলাস ও কল্পনা-প্রবণতা ছিল এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য। অবশ্য এখানে ওখানে এই সাধারণ ভাবধারার ব্যতিক্রম দু'একজন

কবি যে জন্মান নি এমন নয়। ইতিমধ্যে যন্ত্র-দানবের ক্রমোন্নতিশীল অভিযানের ধ্বনি বিলাসী কবিদের ভাব-কুঞ্জবনে একটু সাড়া এনেছিল বই কি! কিন্তু তার প্রভাব স্থায়িত্ব এবং প্রখরতার দিক থেকে মারাত্মক নয়। তার পরই এল প্রলয়ংকর মহাসমর : মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এমন প্রলয়কারী বিপর্যয় আর ঘটেছে ব'লে মনে হয় না। তাই প্রাক্-সামরিক ইংরেজী কবিতা এবং সমরোত্তর ইংরেজী কবিতায় তফাৎ অনেক—আকাশ আর সমুদ্র—স্বপ্ন আর বাস্তব। আজকের দিনের অবিশ্বাস, নৈরাশ্য এবং বিক্ষত ধূলিকীর্ণ এই পৃথিবীর রূপ সেদিনের কবিতায় আসবে কি ক'রে? এই ব্যাপক পরিবর্তনের হাত থেকে আমাদের বাংলা করিতাও বাদ যায়নি'।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সে-কথা বোধ হয় অনস্বীকার্য। আর এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং এতে নিন্দনীয় কিছু নেই। বর্তমান বাংলা কবিতার জনকোপম মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর অমর কাব্যের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মিল্টনের কাছ থেকে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিল্প চাতুর্যের জন্য ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের কাছে বহু পরিমাণে ঋণী। আজকের দিনের অতি-আধুনিক বাঙ্গালী কবিরাও তেমনি তাঁদের অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন এলিয়ট, পাউণ্ড, অডেন্, কামিংস্ প্রভৃতি কবিদের কাছ থেকে। তবে এঁদের সঙ্গে মাইকেল বা বঙ্কিমের সঙ্গে তফাৎ এই যে তাঁরা যে সব সাহিত্যিককে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ক'রেছিলেন তাঁদের প্রতিভা সর্ববাদিসম্মত আর এই শেষোক্ত বিদেশী সাহিত্যিকদের প্রতিভা সর্বজন স্বীকৃত নয়। এঁরা আমাদেরই সমসাময়িক কবি। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিম বা মাইকেল তাঁদের রচনার টেক্‌নিক্ এবং গঠন-সৌকর্যের জন্যই বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছে ঋণী। রচনার বিষয়বস্তু এবং ভারধারা সম্পূর্ণ তাঁদের নিজস্ব—আমাদের দেশজ মাটিতেই তার জন্ম। কিন্তু

আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের অনেকের রচনা-রীতি, টেক্‌নিক্‌, ভাবধারা প্রভৃতি প্রায় সবই বিদেশী কবিদের কাছ থেকে ধার করা। মাইকেল এবং বঙ্কিমের পরেই বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্ম নিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। একা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অত্যদ্ভুত প্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের উপর বিরাট মহীরুহের মত দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর কিছুদিনের জন্য বাংলা কবিতায় যেন সৃষ্টির বন্যা এল। বিশ্বের বহু ভাবধারার অপূর্ব সংমিশ্রণ আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে। বৈষ্ণব কবি, সংস্কৃত কবি, সুফী কবি, ইংরেজ কবি প্রভৃতি সবাই রবীন্দ্র-কাব্যে রস জুগিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পর সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত কোন বাঙ্গালী প্রতিভাবান কবি আজও জন্ম গ্রহণ করেন নি। একদিক না একদিক দিয়ে বাঙ্গালী কবিরা সবাই রবীন্দ্রনাথের কাছে কম বেশী ঋণী। রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁর কয়েকজন কৃতী শিষ্যের কাছ থেকে আমরা ভাল ভাল অনেক কবিতা পেয়েছি। রবীন্দ্রকাব্য প্রধানত প্রাণধর্মী—বুদ্ধি এবং আবেগের অপূর্ব সংমিশ্রণ সে কবিতায়। রোমান্টিসিজম্‌ বা কল্পনা বিলাস ও প্রকৃতিবন্দনা ও আধ্যাত্মিকতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার বড় গুণ। কিছুকাল পূর্ব থেকে কয়েকজন বাঙালী কবি রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছেন। এঁদের মতে স্বপ্নের দিন চ'লে গেছে ঃ বর্তমান যান্ত্রিক যুগে নিছক কল্পনা-বিলাস এবং প্রকৃতি বন্দনা অচল। তাঁরা চান রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত সম্পূর্ণ নূতন ধাঁচের কবিতা রচনা কর্‌তে। সাহিত্যিক যুগ চক্রের মত পরিবর্তিত হয় অমেরা তা' জানি। ক্লাসিসিজম্‌ যায়, রোমান্টিসিজম্‌ আসে। আবার নতুন কোন মতবাদ—হয়ত বা ক্লাসিসিজ্‌মেরই রূপান্তর—রোমান্টিসিজ্‌মের স্থান দখল করে—ঠিক নতুন বোতলে পুরাণো মদের মত। রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হ'য়ে বাংলা কবিতার নতুম যুগ সুরু হয়, আমরা সবাই তা চাই। তা নইলে আমাদের সাহিত্য যে তার চিরন্তন গতিবেগ হারিয়ে ফেলে বদ্ধ জলা-

ভূমিতে পরিণত হবে। সাহিত্যানুরাগী কেউ তা চায় না। কিন্তু তাই বলে সাহিত্য স্থষ্টির নামে সাহিত্যিক ব্যভিচার আমাদের কাম্য নয়।

এখন দেখা যাক্, এই যে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির প্রচেষ্টা সে আন্দোলন কখন কেমন করে এল এবং আমাদের অতি-আধুনিক বাংলা কয়িতায় সে কি রূপ পরিগ্রহ করেছে। সমরোত্তর ইংরেজী কবিতার যে নৈরাশ্যবাদ, ইংলণ্ডের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তা ছিল স্বভাবজ এবং ধীরে ধীরে ক্রম-বিবর্তনের নিয়ম অনুসরণ করেই তার আবির্ভাব হয়েছিল। আমাদের বাংলা দেশে তার আক্রমণ কিন্তু আকস্মিক। হঠাৎ আত্ম-সন্তুষ্ট কল্পনা-প্রবণতার হাত এড়ানোর জন্য বাঙ্গালী কবিকুল সমরোত্তর বাস্তব-বাদী ইংরেজ কবিদের কাছে পাঠ নেয়া সুরু করলেন। অবশ্য এই পাঠ নেয়ার মধ্যে নিন্দার বেশী কিছু নেই, কারণ একটা জাতি যখন পুরানো-পদ্ধতি ছেড়ে নতুন উপায়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, তখন সে নিজের দেশে প্রয়োজনীয় প্রকাশ-পদ্ধতি না পেলে, যার সঙ্গে তার যোগ আছে এমন কোন দেশের কাছে হাত পাতবেই। এই হাত পাতার মধ্যে উঞ্ছবৃত্তি নেই, আছে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। কিন্তু এই হাত পাতা যদি নেহাৎ অনুকরণেই পর্যবসিত হয়, তখনি হয় তা নিন্দনীয়। আমাদের বাংলা কবিতায় আজ অনেকটা তাই হয়েছে।

এই আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশে গদ্য কবিতার জন্ম হ'ল। যুগধর্ম বুঝতে পেরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ-বিষয়ে অগ্রণী হলেন। পদ্য ছাড়া গদ্যেও যে কবিতা লেখা যায় তা আজ পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত। মিল জিনিষটা কবিতার অপরিহার্য অঙ্গ নয়। কবিতার প্রাণবস্তু অর্থাৎ হৃদয়াবেগ, কল্পনা ও অনুভূতি যদি থাকে তবে গদ্যেও কবিতা লেখা চলে। বিশ্বসাহিত্যে অনুপম গদ্য কবিতা অনেক রচিত হয়েছে। আমাদের বাংলা দেশেও দু-একজন কবির হাতে আমরা অপূর্ব গদ্য কবিতা পেয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র

মিত্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। গদ্য কবিতার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, কারণ সুরচিত হলে গদ্যও কবিতা হতে পারে। তবে অতি-আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের বিরুদ্ধে আমার যে অভিযোগ তা পরে বলছি।

অতি-আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে মোটামুটি দুটো দল দেখা যায়। একদল কবি আছেন যাঁরা আত্ম-রতিশীল ঃ তাঁদের কবিতা বুদ্ধি-বৈদগ্ধে পূর্ণ—প্রতীক্-বাদী। এস্কেপিষ্ট (Escapist) মনোবৃত্তি এঁদের কবিতায় সুস্পষ্ট। নিত্য নূতন উদ্ভট আঙ্গিকের উদ্ভাবনা নিয়ে এঁরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত। অডেন্, কামিংস্ প্রভৃতি কবি, নতুন নতুন টেক্নিকের উদ্ভাবনের উপরেই যাঁদের কবি-খ্যাতি অনেকটা নির্ভর করে এবং যাঁদের কবিতায় স্পষ্টতার একান্ত অভাব, এঁরা তাঁদেরই উপাসক। অডেন্, কামিংস প্রভৃতি আজও বিদ্বৎ-সমাজে সর্বজন-স্বীকৃত নন—শ্রীমতী এডিথ সিট্ওয়েল্ তো' অডেন্‌কে বিকৃত-মস্তিষ্ক বল্‌তেও কসুর করেননি। এঁদের অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে আমাদের প্রতীক্-বাদী কবিরাও হ'য়ে পড়েছেন অতিমাত্রায় অস্পষ্ট। এ লক্ষণ যে মোটেও বাংলা কবিতার সুদিন সূচিত কর্‌ছে না তা' বলাই বাহুল্য। এঁদের রচনা-রীতি এবং বাক্য-বিন্যাস অতিমাত্রায় বিদেশী ভাবাপন্ন। তদুপরি ঘোরালো ভাষায় অস্পষ্টভাবে এঁরা এঁদের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির রূপ দেন। কবিতা প'ড়ে মনে হয় না যে এঁরা পাঠকসমাজের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধান্বিত। কবিরা কবিতা লেখেন পাঠকরা পড়বেন এই আশাতেই—পাঠক বাদ দিয়ে কবি হওয়া যায় না। এঁদের কবিতা প'ড়ে কিন্তু তা' মনে হয় না। এঁরা যেন নিজেদের জন্যই লেখেন ঃ যদি তাই লেখেন, তবে প্রকাশিত করেন কেন? পাণ্ডু-লিপি প'ড়েই ত নিজেরা খুসী থাক্‌তে পারেন। কবিতায় আভাস ইঙ্গিত বা suggestion-এর স্থান যথেষ্ট আছে তা' আমরা স্বীকার করি। যে-কবিতায় suggestion নেই সে-কবিতা কবিতা-ই নয়। কবিতা বুঝতে হ'লে

পাঠকের অনুভূতি তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার। এঁদের কবিতা যে আভাস ইঙ্গিতের জন্য দুর্বোধ্য আমাদের তা' মনে হয় না। ভাষাগত দুর্বোধ্যতাই এঁদের প্রধান সম্পদ এবং প্রধান দুর্বলতা। এ দুর্বোধ্যতা না-বলার কাল নয়—এ দুর্বোধ্যতা বেশী-বলার ফল। অন্ধ-ভক্তরা হয়ত বল্‌বেন যে এঁদের কবিতা না বুঝতে পারাটা পাঠকের বুদ্ধি-বৃত্তির অপরিচ্ছন্নতা বা intellectual solvenliness-এর ফল। কিন্তু ভালভাবে নিজেকে প্রকাশ কর্‌তে না পারাটা কি বুদ্ধি-বৃত্তির অপরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক নয়? এঁদের কবিতায় আমরা তথাকথিত অবচেতন মনের কতকগুলো অসংলগ্ন ভাবের দেখা পাই—তার চতুর্দিক ঘিরে' থাকে সুকঠিন ভাষার বর্ম। ভাব ভাষা দিয়েত আর কবিতার বিচার করা যাবেনা। কবিতা হিসাবে যদি পাঠকের মনের কোন শ্রদ্ধা এসব কবিতা (?) না পায় তবে শুধু ভাষার চাতুর্যে ফল কি? এসম্বন্ধে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এলিয়ট্ কি ব'লেছেন শুনুন:

And certainly Poetry is something over and above and something quite different from a collection of psychological data about the minds of poets or about the history of an epoch; for we could not take it even as that unless we had already assigned to it a value merely as poetry.—*T. S. Eliot.*

এলিয়টের এই পংক্তি ক'টি আমি অতি-আধুনিক সমস্ত কবিকে মনে রাখতে অনুরোধ করি। তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁরা যা লেখেন তাকে সর্বপ্রথম কবিতা হ'তে হবে।

অতি-আধুনিক আরেক দল বাঙ্গালী কবি আছেন যাঁদের মধ্যে সমাজ-চেতনা খুব প্রবল। তাঁরা ব্যষ্টি-চেতনাকে সমষ্টি-চেতনার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চান। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কবিতাই ব্যক্তিগত চেতনার ফল। কবি নিজের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি কাব্য-রসে

সঞ্জীবিত করে অন্যের প্রাণে সঞ্চারিত করেন। বাংলা সাহিত্যে এই সমাজ-চেতনা-প্রসূত কবিতা সম্পূর্ণ নতুন। ইংরেজী কবিতার কাছে বাংলা কবিতা এদিক দিয়েও ঋণী। সমরোত্তর ইংরেজী সাহিত্যে ব্যাপক নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল, তার স্পর্শ প্রায় অতি-অধুনিক সমস্ত ইংরেজ কবির কবিতায়ই আছে। এঁদের মধ্যে সম্প্রতি কয়েকজন বামপন্থী কবি দেখা দিয়েছেন যাঁদের মধ্যে ঘন নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ করে ক্ষীণ আশার রশ্মি দেখা যায়। ষ্টিফেন্ স্পেণ্ডার, ইশার্উড্, প্রভৃতি এই দলের কবি। এঁরা বুঝেছেন যে কম্যুনিজমেই একমাত্র জগতের মুক্তি সম্ভবপর ; ধনতন্ত্র প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো একদিন এর কাছে পরাভূত হবে। মার্ক্সীয় (Marxist) সমাজ-চেতনাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে তাই তাঁদের কবিতা রচিত। বাংলা কবিতায়ও এই মতবাদের ঢেউ এসে পৌঁছেচে। তবে যে কয়জন বাঙ্গালী কবি এই বামপন্থী দলে আছেন, তাঁদের অধিকাংশের রচনাকেই কবিতা বলতে ভয় হয়। সেগুলো 'প্রপাগাণ্ডা'র নামান্তর মাত্র। তার কারণ তাঁদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা বেশী নয়। অনুকরণ এবং কৃত্রিমতা তাই এসব কবিতায় খুব বেশী। তাঁদের কবিতায় প্রাণ-শক্তির উষ্ণতাও বড় কম। মোট কথা, অতি আধুনিক বাংলা কবিতার গুণ যেমন কতকগুলো আছে, তার দোষও নেহাৎ কম নয়। এই দোষগুলোকে আমাদের সযত্নে পরিহার করতে হবে। নইলে বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার। শুধু অনুকরণ করে কোন সাহিত্য টিকে থাকতে পারে না। বুদ্ধিজীবিত্বের অজুহাতে আমরা যদি উত্তরোত্তর অস্পষ্টতার রেস্ খেলে চলি, তবে অদূর ভবিষ্যতে এই অতি-আধুনিক কবিতার মৃত্যু অনিবার্য।

অতি-আধুনিক আন্দোলনের ফলে কবিতার বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য আজ বেড়ে গেছে। যে-কোন বিষয় নিয়ে আজ চমৎকার কবিতা লেখা যেতে পারে। বাংলা কবিতায় কোন বিষয়ই আজ আর অপাংক্তেয়

নয়। বাংলা কাব্য চিরদিন প্রেমের কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ। আজ অতি-আধুনিক আন্দোলনের ফলে তরুণ কবিরা প্রেমকে প্রায় ভুল্‌তে ব'সেছেন—বোমা আর সেল্, ইলেক্‌ট্রন্ আর প্রোটিন্ নিয়েই যেন সবাই ব্যস্ত। সুখের বিষয় দুচারজন অতি-আধুনিক কবি এখনও আমাদের চমৎকার প্রেমের কবিতা শোনান। নরনারীর এই প্রেমের রহস্য চিরন্তন; কোনদিন এর মৃত্যু হবেনা—তাই প্রেমের কবিতারও কোনদিন মৃত্যু হবেনা। অতি-আধুনিক কবিতা ধ্বংসকারী; পুরাণো আদর্শ আজ ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু নতুন আদর্শ আজও সৃষ্টি হয়নি। তার কারণ অতি-আধুনিক কবিদের মধ্যে যুগ প্রবর্তনকারী কোন প্রতিভাবান্ কবি আজও জন্মান নি। যে-দিন সেরূপ কোন প্রতিভার জন্ম হবে, সে-দিন আসবে বাংলা কবিতার সত্যিকারের রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির দিন। আজকের কবিরা শুধু সেই অনাগত প্রতিভার পথপ্রদর্শক। যাক্, বর্তমান অতি-আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে-সব দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, তার সম্বন্ধে কবিদের অবহিত হতে বলেই বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করি।

॥ নতুন কবিতার ভবিষ্যৎ ॥

শুধু বাংলা দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই আজ কবিতার অনাদর। বাংলা দেশে হয়তো এ অনাদর আপেক্ষিকভাবে আরও বেশি বলে মনে হয় এই কারণে যে, এখানে কবিতার সৎপাঠকের সংখ্যা পূর্বাপরই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বর্তমানে তা আরও সীমাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা ফ্রান্সের মত রাষ্ট্রে যেখানে শিক্ষিত নবনারীর হার আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি এবং যাদের ক্রয়ক্ষমতাও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সেখানেও আধুনিক কাব্যপাঠকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুলনামূলক ভাবে তাদের দেশের কাব্যপাঠক সংখ্যা আমাদের দেশের তুলনায় বেশি হলেও আধুনিক কবিতা যে সেসব দেশেও জনপ্রিয় নয় একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। জন-চিত্তের সঙ্গে আধুনিক কবিতার এই যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে এর জন্য সমালোচকরা মূলত দায়ী করেন আধুনিক কবিকুলকে। তাঁরা নাকি নিজেদের কবিতার অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার দ্বারা পাঠক সমাজকে বিদ্বিষ্ট করে তুলেছেন। এ অভিযোগ অংশত সত্য হলেও আধুনিক কবিতার অনাদরের জন্যে একেই একমাত্র দায়-ভাগী করা চলে না।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পুরাতন ঐতিহ্যের কবিতা ও নতুন কবিতার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। তবে এ যুগে পুরাতন ঐতিহ্যের কবিতা একেবারে লেখা হচ্ছে না—এমনও নয়। আমাদের দেশে এখনও পুরাতন ঐতিহ্যের ধারাবাহী অনেক কবি নিত্য নতুন কাব্য সৃষ্টি করছেন এবং তাঁদের রচনা নতুন ঐতিহ্যবাহী কবিদের সৃষ্টির পাশাপাশিই প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে তাঁদের কবিতা নতুন কবিদের কবিতার তুলনায় বেশি

জনপ্রিয় এমন কথা মনে করার কোন হেতু নেই। অভ্যস্ত ছন্দ মিল, প্রচলিত ভাবধারা এবং সুবোধ্যতা যদি কবিতার জনপ্রিয়তার হেতু হয়, তবে এ সব গুণই তাঁদের কবিতায় বিদ্যমান। তবু নতুন কবিতার মত সে কবিতারও যখন দুর্দশা দেখি তখন মনে হয় যে বর্তমান যুগে নিছক দুর্বোধ্যতার জন্যে নয়, অন্যান্য কারণে কবিতার আদর কমে গেছে। সাহিত্য পাঠকের সংখ্যা কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান কাটতি সেই সংখ্যা বৃদ্ধির সাক্ষ্যই বহন করে। গদ্য-সাহিত্যের এই শ্রীবৃদ্ধি এবং কবিতার তুলনামূলক অনাদর দেখে বহু কাব্যরসিকই আজ ভাবতে সুরু করেছেন যে কবিতার যুগ শেষ হয়ে গেছে, সুরু হয়েছে গদ্যের যুগ। আমরা যতই চেষ্টা বা আন্দোলন করি না কেন কবিতার সে স্বর্ণ-যুগকে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না।

তা হলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে কবিতার একটা স্বর্ণযুগ ছিল। সেই স্বর্ণযুগের কথা ভাবতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হয় আদিমতম যুগে—যখন মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি। মানুষের সাহিত্য-শিল্পে প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল কবিতার এবং সে-কবিতা প্রায়শই গীত হত। মুখে মুখে কবিতা প্রচারিত হত গ্রাম থেকে গ্রামে—দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কাব্যকাহিনী, পৌরাণিক কথা, ধর্মীয় উপাখ্যান তখন ছিল কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কবিতার মাধ্যমেই তখন মানুষের গল্প উপন্যাস পাঠের আনন্দ মিলত। কবিতা যখন কণ্ঠাশ্রয়ী ছিল তখনই বোধহয় ছিল তার স্বর্ণযুগ। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর কবিতা যখন প্রচারিত হতে থাকল ছাপা বইয়ের মাধ্যমে, তখন তার চারিত্রিক পরিবর্তন যেমন সূচিত হল, তেমনই সুরু হল শ্রোতাদের সঙ্গে তার ব্যবধান। সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব ও দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি বহুলাংশে কাব্যের জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তনের ফলেও মানুষের মনন ও রুচির বহু পরিবর্তন হল। এই সর্বপ্রকার পরিবর্তনের সম্মিলিত

ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি আধুনিক কাব্যজগতের উপরে। একদা গান রূপে যে কবিতা অতি সহজেই লোকের প্রাণে প্রবেশ করত, তা যখন একই সঙ্গে শ্রুতি, চক্ষু ও মননগ্রাহ্য হয়ে উঠল, তখন তার পাঠক সংখ্যা কমতে সুরু করল। একথা অনস্বীকার্য যে, সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কবিতার রূপ ও রস হল সূক্ষ্মতম অনুভূতির। একটি সূক্ষ্ম নিটোল কবিতা পাঠের যে আনন্দ, সে আনন্দ অন্য কোন সাহিত্য দিতে পারে না। কিন্তু এ আনন্দ পেতে হলে চাই সংবেদনশীল মন ও সহানুভূতিপ্রবণ অনুধ্যান। কবিতার রস নিছক বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়—হৃদয়-গ্রাহ্য। তাই দেখা যায় যে এমন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি থাকেন যাঁরা সর্ববিধ অলঙ্কার শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েও কবিতার প্রকৃত রসানুগ্রাহী হতে পারেন না। কোন একটি কবিতার ছন্দ, অলঙ্কার, উপমা, অনু-প্রাস সম্বন্ধে চুলচেরা বাছ-বিচার তাঁরা হয়তো করতে পারেন—কিন্তু কবিতাটির মর্মমূলে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেন না। এ ধরণের বহু পণ্ডিত সমালোচকের সম্মুখীন আমাদের প্রতিনিয়তই হতে হয়, কারণ যে-কোন রসোত্তীর্ণ সার্থক কবিতারই প্রায় দুটি রূপ থাকে—একটি তার বাচ্যার্থ এবং অপরটি তার ব্যঞ্জনার্থ। ব্যঞ্জনার্থ ধরতে না পারলে কবিতার রসানুভূতি হয় না।

কবিতা যেদিন থেকে কাহিনী নিয়ে কারবার করা ছেড়ে দিয়েছে এবং সে দায়াধিকার তুলে দিয়েছে গদ্যাশ্রয়ী গল্প উপন্যাসের হাতে, সেদিন থেকে ব্যঞ্জনার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে কবিতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কাহিনী-প্রধান কবিতার ব্যক্তিমানসাশ্রয়ী লিরিকে রূপান্তর তাই কাব্যজগতে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছিল। ব্যক্তি-মানসের দুর্নিরীক্ষ ভাবকল্প নিয়ে উনবিংশ শতকে যাঁরা লিরিক রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা সেদিন স্বাভাবিক কারণেই প্রচলিত কাব্য-ধারার অনুবর্তন করতে পারেননি এবং পারেননি বলেই তাঁদের সেদিন তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সাহিত্যের ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যাবে যে সেদিনের সে সমালোচনা আজকে যাঁরা

নতুন কবিতার বিরোধী তাঁদের সমালোচনার তুলনায় কম তীব্র ছিল না। কাল পরিবর্তনের ফলে দেখা গেছে যে সেদিন কবিরা ভুল করেন নি—ভুল করেছিলেন সমালোচকের দল। নতুন কবিতা নিয়েও গত তিনদশকে যে আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, তাতেও এই এই সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তিন দশক পূর্বে এই বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালেই যাঁরা রবীন্দ্র-কাব্যধারার অনুবর্তন না করে নতুন পথে যাত্রা সুরু করেছিলেন, তাঁদের কবিতা নিয়ে সেদিন তীব্র সমালোচনার উদ্ভব হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ বিরোধিতা করেন নি। তার কারণ তিনি নিজেও কবিতার এ পার্শ্ব-পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং করেছিলেন বলে তিনিও নতুন ধারার সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। তার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর জীবনের শেষ পনের বৎসরের কবিতাবলী। প্রচলিত কাব্য ধারার সমর্থক নয় বলেই নতুন বাংলা কবিতার নিন্দায় সেদিন যাঁরা মুখর হয়ে উঠেছিলেন, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁরা মিথ্যা ভবিষ্যদ্‌বক্তা বলে প্রমাণিত হয়েছেন। সেদিনের বহুনিন্দিত একাধিক কবি তদানীন্তন দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে উঠে সুবোধ্য না হলেও বোধ্য হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের কবি-প্রতিভা সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রবীণতার পর্যায়ভুক্ত এই কবিদের মধ্যে কেউ কেউ আবার যৌবনের বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে রক্ষণশীল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তবে মোটা-মুটি সেদিন তাঁরা বাংলা কবিতায় যে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে-ছিলেন, তাকে তার পূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে তরুণতর কবিদের অভাব হয় নি। আজও বহু তরুণ কবি সে-পথে এগিয়ে আসছেন এবং তাঁদের নিত্য নতুন সৃষ্টিতে বাংলার কাব্য-ভাণ্ডার ভরে তুলতে চেষ্টা করছেন। প্রচলিতে বিশ্বাসী যেসব রক্ষণশীল সমালোচক ভেবেছিলেন যে নিছক রবীন্দ্রানুসরণ না করলে বাংলা কবিতা রসাতলে যাবে, যাঁরা এমন কথাও বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পরে

আর নতুন কবিতা লেখা সম্ভব নয়, তাঁরা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছেন। গত ত্রিশ বৎসরের বাংলা সাহিত্যে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সার্থক কবিতার সংখ্যাও যে নগণ্য নয় তা প্রমাণিত হয়েছে একাধিক আধুনিক কবিতার সঙ্কলনে। ইংরেজ কবি-সমালোচক সিসিল ডে লুইস বলেছেন: "Truth is poetry's only defence, and true poetry can defend itself." তাঁর এ উক্তি যে কত সত্য গত ত্রিশ বৎসরের বাংলা কবিতার অস্তিত্ব ও পুষ্টি তা প্রমাণিত করে।

হয়তো আজকের দিনে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মত কোন মহীরুহ নেই এবং রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে সেরূপ কোন মহীরুহের প্রত্যাশা করাও বৃথা। তা ছাড়া বিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক যুগে এরূপ কোন মহীরুহ ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে কিনা সে বিষয়েও সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান রাজনীতি ও সমাজনীতির যেদিকেই আমরা তাকাই সেদিকেই দেখতে পাই যে তথাকথিত মহীরুহের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। একক প্রতিভায় পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করা আজ প্রায় অসম্ভব এই কারণে যে প্রাকৃতিক নিয়মে ভোগ্য পণ্য আজ যেমন ব্যক্তিবিশেষের কুক্ষি ছেড়ে সমাজের আওতায় চলে যাচ্ছে তেমনই সাহিত্য-শিল্পের সৃষ্টি ক্ষমতাও ছড়িয়ে পড়েছে জন-সমাজে। কবিতাও একক প্রতিভার এই গণতন্ত্রীকরণের নিঃসন্দেহ স্বাক্ষর বহন করে। কোন একজন কবির কাব্যরচনা বিপুলায়তন না হলেও এবং উৎকর্ষের দিক থেকে তাঁর প্রতিটি কবিতাই বিশেষ উল্লেখের দাবী করতে না পারলেও, এই তিন দশকে সামগ্রিকভাবে যে কবিতা রচিত হয়েছে উৎকর্ষের বিচারে তাদের সংখ্যা কম নয়।

বাংলা কবিতা তার গত ত্রিশ বৎসরের অগ্রগতির সময় কখনও উন্মার্গ হয় নি একথা বলতে পারলে খুসি হতাম। এরূপ উক্তি করলে সত্যের ব্যভিচার হয় বলে তার ভ্রষ্টাচারের দু-একটি নিদর্শন

তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করি। বলা অনাবশ্যক যে এই ভ্রষ্টাচার সাময়িক হলেও তার আঘাতে নতুন বাংলা কবিতার অগ্রগতি সময়ে সময়ে ব্যহত হয়েছে। তবে তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায় সর্ববাদী-স্বীকৃত বলে একে ক্ষমা করা চলে। এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রথমে দেখা দিয়েছিল নতুন বাংলা কবিতার সূত্রপাতে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে বরবাদ করার অত্যুগ্র উৎসাহে সেদিন একদল তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক ঐতিহ্যের মূল সূত্র অনুধাবন করার চেষ্টা না করেই বহুল পরিমাণে ঝুঁকে পড়েছিলেন দেহবাদের দিকে এবং আঙ্গিকের অভিনবত্বের দিকে। সুস্থ দেহবাদের সঙ্গে অবশ্য কবিতা বা গদ্য সাহিত্যের কোন বিরোধ নেই। তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের সার্থক কবিতা বা গল্পউপন্যাসের মধ্য থেকে দেওয়া চলে। কিন্তু দেহবাদ যদি উদ্দেশ্য-বিবর্জিত হয়, নিছক নতুনত্ব সৃষ্টিই যদি তার অভিপ্রেত হয় তবে তা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, নিছক অশ্লীলতার পর্যায়ে নেমে যেতে পারে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি উল্লিখিত কাব্য আন্দোলনে। তবে সুখের বিষয় নতুন বাংলা কবিতার আন্দোলনে এ প্রভাব নিছক স্বাভাবিক কারণেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভ্রষ্টাচার আমরা লক্ষ্য করেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তখন প্রগতি আন্দোলনের নামে বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ-ঘেঁসা কবিতা রচনা করা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিনের তরুণ কবিরা এই প্রগতি আন্দোলনের আওতায় পড়ে অনেক অপসৃষ্টি তো করেছিলেনই, যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ও খ্যাতিমান ছিলেন তাঁরাও সেদিন তার মারাত্মক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সে কয়'বছরের সাহিত্য-পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্‌টালেই আমার এ উক্তি যাথার্থ প্রমাণিত হবে। সেই প্রগতি আন্দোলনের ঝোঁকে অনেক খ্যাতিমান কবি সে সময় যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, সে-সব আজ তাঁদের সামনে তুলে ধরলে

তাঁরা হয়তো লজ্জা বোধ করবেন। আমার এ উক্তিতে কেউ যেন ভাববেন না আমি কম্যুনিস্ট মতবাদ বা অন্য কোন রাজনৈতিক মতবাদকে কাব্যের উপজীব্য করার বিরোধী। আধুনিক যুগে বাস করে এ ধরণের যুক্তিহীন মতবাদ আমি পোষণ করি না। যে কোন বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা সম্ভব। রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে কিছু কিছু সার্থক কবিতাও রচিত হয়েছে এবং সাহিত্যের দরবারে তাদের স্থান হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ রচনাই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তার কারণ তাদের বেশির ভাগই লেখা হয়েছিল হুজুগে পড়ে—প্রাণের তাগিদে নয়। খাঁটি কবিতার পিছনে এই প্রাণের তাগিদ একটা বড় জিনিস। আমি যদি শুধু একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হই, তাহলেই আমার পক্ষে সে মতবাদ নিয়ে ভাল কবিতা লেখা সম্ভব হবে—এমন কোন কথা নেই। কবিকে প্রথমত সে মতবাদ আত্মস্থ করে নিতে হবে—তবেই তাকে কবিতার পর্যায়ে রসোত্তীর্ণ করা সম্ভব হয়ে উঠবে। যুদ্ধকালীন প্রগতিবাদী কবিতায় এই ধরণের কবি-কর্মের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় নি। কবিরা যা করেছেন তা হল কতকগুলি বাঁধাবুলির পুনরাবৃত্তি—উদ্ভট উপমা উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় গ্রহণ এবং রাজনৈতিক বুলেটিন জাতীয় জিনিসকেই কবিতা রূপে চালানোর চেষ্টা। বলা বাহুল্য, যে দেশের ও সমাজের অবস্থা এ প্রয়াসের আদৌ অনুকূল ছিল না বলে তা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে নি।

এই কৃত্রিম প্রগতিবাদী রচনার প্রয়াসের পিছনে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমথন ছিল এবং এই সমর্থনের জোরে যা কবিতা নয় তাকেও কবিতা বলে চালানোর চেষ্টা আমরা দেখেছি। এই হিড়িকে অনেকের তথাকথিত কবিতার বই-এর সাময়িক কাটতিও হয়েছে। কিন্তু এতে নতুন কাব্য আন্দোলনের অগ্রগতিতে সহায়তা তো হয়ই নি, বরং খাঁটি কাব্য সম্বন্ধে জনমানসে বিভ্রান্তি চেষ্টার ফলে ক্ষতিই হয়েছে। এই হিড়িকের সময় জঙ্গী রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু

নিয়ে কবিতা লেখাটা প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন কাব্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে একদল আঙ্গিকবাদী কবি নিছক আঙ্গিকের উপর জোর দিয়ে কবিতার ক্ষতি করবার প্রয়াস করেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—'শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ'। তেমনই এই প্রগতিবাদী কবিরা অত্যধিক জোর দিয়েছিলেন বিষয়-বস্তুর উপর। কিন্তু খাঁটি কবিতা নিছক বিষয়-বস্তুর জোরে যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তেমনই নিছক আঙ্গিকের জোরেও তার প্রকৃত রস সৃষ্টি হয় না। খাঁটি কবিতাতে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের একটা সুন্দর সমন্বয় ঘটে। ঐ সমন্বয় কেমন করে ঘটে তা বলা শক্ত—কিন্তু যেখানে এ সমন্বয় ঘটে সেখানে কবিতাকে চিনে নিতে খুব বেগ পেতে হয় না।

সুখের বিষয়, আমাদের নতুন কবিতা আন্দোলনে এ অসুস্থ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অশন ব্যসনের ক্ষেত্রে যেমন তেমনই কবিতার ক্ষেত্রেও ফ্যাশন বলে একটা জিনিষ আছে। এই ফ্যাশনের মোহে কবিতা মাঝে মাঝে বিপথগামীও হয়। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত শক্তির স্বল্পতা হেতু এই ধরণের ফ্যাশন স্থায়ী হয় না। আশার কথা এই যে, কবিতার এই দুর্দিনেও এমন কয়েকজন কবি বাংলা দেশে ছিলেন যাঁরা ফ্যাশনের মোহে ভোলেন নি। উচ্চ কণ্ঠের ভীড়ে সাময়িকভাবে তাঁদের নিম্ন গ্রামের কণ্ঠ হারিয়ে গেলেও তাঁরা দিক্‌ভ্রান্ত হন নি—তাঁদের অনুচ্চ কণ্ঠের কাব্য সাধনা ছিল অব্যাহত। চটকদার জনপ্রিয়তার হাতছানি তাঁদের বিভ্রান্ত করতে পারে নি বলেই আজ আবার আমরা বাংলা কাব্যজগতে সুস্থতার আবহাওয়ায় ফিরে আসতে পেরেছি। নতুন বাংলা কবিতা রচনায় গত এক দশকের ইতিহাস এই সুস্থতার দিকে উত্তরণেই ইতিহাস। আর এ ইতিহাসে আমাদের তরুণতর কবি সমাজের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। অব্যবহিত পূর্ব যুগের উন্মত্ততা কাটিয়ে উঠে তাঁরা সুস্থতার পথে পা বাড়িয়েছেন।

এ সুস্থতার অর্থ কিন্তু প্রচলিতকে মেনে নেওয়া নয়। পূর্বসুরীদের সঙ্গে তুলনায় আজকের তরুণ কবিদের মধ্যে কাব্যে বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস কম প্রকট নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে প্রচলিতকে বর্জন করে নতুন পথে হাঁটলেই নতুন কবিতা রচনা করা যায় না। পুরাতন এবং প্রচলিতের মধ্যে সবই বর্জনযোগ্য নয়—তার কিছু গ্রহণযোগ্যও আছে। যেটুকু গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করে বাংলা কবিতার নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে আজ তাঁরা উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। তাঁরা আজ এ সত্য বুঝেছেন যে দল করে আর যাই করা যাক কাব্য সৃষ্টি করা যায় না। প্রকৃত কবিতা সৃষ্টি ব্যক্তি-মানসের ব্যাপার। এই ব্যক্তি-মানস যত স্বতন্ত্র হবে, কবিতাও হবে তত স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। বিরুদ্ধবাদীরা এক সময়ে নতুন কবিতা সম্বন্ধে একটা বড় অভিযোগ এই করতেন যে, সকলের কবিতাই এক সুরে বাঁধা—কোন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে না। আজ আর এ অভিযোগ ততটা ঘাতসহ নয়। নতুন কবিদের দৃষ্টি আজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বুদ্ধিবাদ আজকের কবিতার বড় বৈশিষ্ট্য হলেও নতুন কবিদের কাছে আজ কোন বিষয়বস্তুই অপাংক্তেয় নয়। মানুষ তো তাঁদের কবিতার মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে আছেনই, তাঁদের কেউ কেউ আবার ভুলে-যাওয়া প্রকৃতির দিকেও দৃষ্টি ফিরিয়েছেন এবং তার নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা করছেন। কাব্যে রাজনীতিকেও তাঁরা বর্জন করেন নি সত্য—কিন্তু রাজনীতিকে তাঁরা কাব্যের একমাত্র উপজীব্য করেও রাখেন নি। কবি যখন সমাজ-বহির্ভূত জীব নন, তখন তাঁর একটা রাজনৈতিক সত্তাও থাকে। সে সত্তা তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে উঁকি দেবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। নতুন কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা জাগে যখন দেখি যে আজকের কবি মানুষের খণ্ডিত সত্তা নিয়েই ব্যস্ত নন—তিনি তাঁর সামগ্রিক সত্তার রূপায়ণেই আগ্রহান্বিত। মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে আমরা জেনেছি যে মানুষের মনের যে পরিচয় আমরা পেয়ে এসেছি সেটাই তার একমাত্র

পরিচয় নয়। সচেতন মনের নীচেও অবচেতন ও অচেতন মনের যে স্তর পড়ে আছে তা এক অজ্ঞাত নতুন জগৎ বিশেষ। আজকের বহু কবিতায় সেই অবচেতন ও অচেতন মনের সমুদ্র পরিমাপের প্রয়াস খুঁজে পাওয়া যায়। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে দুর্জ্ঞেয় মানুষ আজ বহুলাংশে সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। তবু তার দুর্জ্ঞেয়তার অবসান ঘটে নি। প্রকৃতির সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে আমরা অনেকটা বশীভূত করেছি—কিন্তু তার পূর্ণ রহস্য আমরা আজও উদ্ধার করতে পারিনি। মানুষ ও প্রকৃতির এ রহস্য যতদিন অজ্ঞাত থাকবে, ততদিন মানুষের মনে কবিতাও থাকবে। তাই মনে হয় যে গদ্যের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সত্ত্বেও, যন্ত্রযুগের এবং বৈশ্যসমাজের অনুদারতা সত্ত্বেও, কবিতার মৃত্যু হবে না। তার কারণ এমন কতকগুলি হৃদয়াবেগ ও অনুভূতি আছে যার প্রকাশ শুধু কবিতাতেই সম্ভব—গদ্যে নয়। মন্ত্রের মধ্যে যে প্রভাব আছে, কবিতার মধ্যে প্রায় সেই প্রভাব আছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

নতুন কবিতার বিরুদ্ধে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ত্রিশ বৎসর আগে আনা হত আজও সে অভিযোগ একেবারে নির্মূল হয়ে যায় নি। যদিও গত ত্রিশ বৎসরে নতুন কবিতার সমর্থক সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এই সমর্থক সংখ্যা বেড়ে যাবার অর্থ হল সমর্থকেরা এর মধ্যে কিছু না কিছু অর্থ আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তাই এ কবিতা বোঝা যায় না একথা জোর গলায় বলা চলে না এবং বুঝতে পারলে এ কবিতায় রসও যে পাওয়া যায় তার প্রমাণ এই সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি। নতুন কবিতার অস্পষ্টতা ও দুরূহতা অনেকটা সহজাত কারণ সঞ্জাত। পুরাতন যে কাব্যধারা আমরা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সম্প্রসারিত দেখেছি, সেখানে কবিতায় ন্যায়শাস্ত্রানুসারী ভাববিন্যাস ছিল প্রচলিত। আজকের কবিতায় ভাববিন্যাস অনেকটা আবেগানুসারী। কবির মনে যখন যে চিত্র ভেসে ওঠে তাকে তিনি

ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম মেনে কবিতায় গ্রথিত করেন না—তাকে তিনি গ্রথিত করেন স্বীয় আবেগানুসারে। সেখানে কবির মানসিক পরিমণ্ডলে যদি পাঠক সহানুভূতিশীল চিত্তে প্রবেশ না করেন তাহলে তাঁর পক্ষে কবিতার রসগ্রহণে বাধা জন্মাবে। এটি আধুনিক কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য। চেষ্টা করেও এ বৈশিষ্ট্য এড়ানো প্রায় অসম্ভব। পাঠককেই এখানে চেষ্টা করে কবির ভাব-পরিমণ্ডলের রহস্য উদ্ঘাটন করে নিতে হবে। নতুন কবিতার পাঠক দ্বিতীয় বাধা পায় ভাষা ও পদবিন্যাসের অভিনবত্বে। কাব্যে চিরকাল চলে এসেছে এমন সব কথা আধুনিক কবিরা প্রায় ইচ্ছে করেই বর্জন করেন। তার কারণ বহু ব্যবহারের ফলে সে-সব কথা এত পুরনো ও একঘেয়ে হয়ে গেছে যে তাঁরা যে অর্থ বোঝাতে চান সে অর্থ পুরানো কথার দ্বারা বোঝানো যায় না। তাই কবিতায় যা হয়তো কোনদিন ব্যবহৃত হয়নি এমন কথা তাঁরা ব্যবহার করে বসেন এবং তাতে অনভ্যস্ত কাণে রসবোধে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। একাধারে কাব্যিক ও অকাব্যিক কথার সংমিশ্রণে কবিতার পদবিন্যাস যে নতুন রূপ নেয়, তার মাধুর্য উপভোগের জন্যে প্রয়োজন হল যথারীতি শিক্ষিত কাণের ও মনের। বলা বাহুল্য, এ শিক্ষা আমাদের অনেকেরই নেই এবং নতুন রীতিতে নতুন কবিতা উপভোগের জন্যে সে শিক্ষা-লাভেও আমরা আগ্রহান্বিত নই। কবিতার প্রচলিত মাপকাঠিতে বিচার করেই আমরা নতুন কবিতাকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি। নতুন কবিতা যদি নতুন বোতলে পুরনো মদ ছাড়া অন্য কিছু হয়, তাহলে তাকে বোঝার জন্যে নতুন প্রয়াস করতে হবে—প্রয়োজন হলে তার জন্যে নতুন নন্দন-তত্ত্বের সৃষ্টি করতে হবে।

শুধু বাংলা দেশে নয়, পৃথিবীর সব প্রাগসর দেশেই যন্ত্রপ্রধান বৈশ্যযুগ নতুন কবিতার চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরোপ্লেন, রেডিও, সিনেমা, ঘোড়দৌড়, খেলার মাঠের উত্তেজনা ও রাজনৈতিক

শ্লোগানের পাল্লায় পড়ে কবিকণ্ঠ আজ প্রায় নিমজ্জিত। তাই অনেকেরই মনে সংশয় জাগে এ যুগ কবিতা পুষ্পিত হবার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। কথাটা অনেকখানি সত্য। কবিতা আজ সাধারণ পাঠকের দরবার ছেড়ে গোষ্ঠী-পাঠ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু মনে হয় যে এই বর্তমান যুগই কবিতার ক্ষেত্রে শেষ কথা উচ্চারণ করবে না। পৃথিবীতে আবার সুস্থতা ফিরে আসবে—মানুষ আবার কবিকণ্ঠ শোনার জন্যে উচ্চকিত হয়ে উঠবে। কেননা কবির মত এমন করে মানুষের মনের কথা কেউ বলতে পারে না। নতুন কবিতার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই আছে—তবে কবিকুলকে হতে হবে সংযমী, সত্যাশ্রয়ী ও দুঃসাহসী পথের যাত্রী। যন্ত্র এবং বিজ্ঞান যখন পৃথিবীতে থাকতেই এসেছে, তখন তাদের সম্বন্ধেও পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে আধুনিক কবিকে এবং কাব্যে তাদের রূপদান করতে হবে। আজকের কবিতার বহুমুখী বিস্তার মনে এই আশার সঞ্চার করে যে ভবিষ্যতে কবিতা আজকের উপেক্ষা ও অনাদর কাটিয়ে উঠে সকলের জীবনেই বরণীয় হয়ে উঠবে।

॥ বাংলা অনুবাদ সাহিত্য ॥

আমার প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে কেউ ভাববেন না যে বাঙলা ভাষার অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। সে ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এমন একটা পুরনো জগতে প্রবেশ করতে হবে যার বিস্তৃতি ও গভীরতাই অনেকখানি। সে আলোচনাকে একটি ছোট প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু করে তোলা যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন তার সঙ্গে আধুনিক বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সামঞ্জস্য বিধান করা। একশ দুশো বছর আগে কবে কোন পারসী বা সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছিল এবং তারও পরে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ঐকান্তিক যোগাযোগ স্থাপিত হবার পর কোন কোন লেখক উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষা থেকে গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তার কাহিনী নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক গবেষণার বিষয়। বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে সে আলোচনা হলে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের দিগ্‌দর্শনে যে অনেকখানি সহায়তা হবে সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই। তবে এ ক্ষেত্রে আমার একটা সন্দেহ আছে এবং সে সন্দেহ একেবারে অমূলক এমন কথা বলতে পারি না। বাংলা গল্প, কবিতা বা উপন্যাস সাহিত্যের যেমন একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, অনুবাদ সাহিত্যের তেমন কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। বাংলা অনুবাদ সাহিত্য কেমন যেন এলোমেলো বিশৃঙ্খল—যুগমানসের চেয়ে ব্যক্তি-মানসের খেয়াল খুসির দ্বারাই তা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি আজও।

বাংলা সাহিত্যের বিগত দুই দশকের ইতিহাসের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। এই দুই দশকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যেতে আমি দেখেছি। কিন্তু এই দ্রুত অনুবাদ বৃদ্ধির ফলে আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের খুব একটা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। তার কারণ ওই ব্যক্তিমানসের খেয়াল খুসি—অনুবাদের পিছনে সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব। গত দুই দশকে বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ এবিষয়ে কম্যুনিস্ট মতাবলম্বী বামপন্থী লেখক লেখিকাদের অত্যুৎসাহ। তাঁদের এই অত্যুৎসাহের পিছনে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের উন্নতি সাধনের সক্রিয় প্রয়াস ততটা নেই, যতটা আছে নিজেদের দলীয় মত-বাদ-প্রচারের চেষ্টা এবং বিশেষ এক শ্রেণীর বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে দেশবাসীদের পরিচিত করানোর অভিপ্রায়। যে দুই দশকের কথা এখানে আলোচনা করছি, সেই দুই দশকের অনুবাদ সাহিত্যের একটা হিসাব নিকাশ করলে দেখা যাবে যে এই জাতীয় অনুবাদের সংখ্যাই সমধিক। বিদেশী সাহিত্যে যে সব ক্লাসিকস্ পর্যায়ের বই বাংলা ভাষায় তাদের অনুবাদের সংখ্যা আদৌ আশানুরূপ নয়। এ অবস্থা বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের দৈন্যই কি সূচিত করে না? একথা অবশ্য অন-স্বীকার্য যে ইদানীং রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত দু'চারটি ভাল বিদেশী বইও বাংলায় অনূদিত হচ্ছে এবং বিদেশী সাহিত্যের ভালো জিনিস পাঠকপাঠিকাদের কাছে উপস্থাপিত করবার একটা প্রয়াস ও প্রবণতা দেখা দিয়েছে অনুবাদকদের মধ্যে। অনুবাদ সাহিত্যের দিকে এই যে একটা ঝোঁক এসেছে সেটা আশার কথা এবং বলা বাহুল্য যে এর পিছনে প্রচারমূলক সাহিত্য অনুবাদকারা বাম-পন্থীদের দান আছে।

একটা স্বতন্ত্র অনুবাদ সাহিত্য থাকা যে কোন জাতির সাহিত্যের পক্ষেই গৌরবজনক বলে বিবেচিত হয়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য যে এত সমৃদ্ধ তার পিছনে তার সুবিস্তৃত অনুবাদ সাহিত্যের মূল্য বড় কম

নয়। ফরাসী, জার্মান, গ্রীক, লাটিন, রুশ, জাপানী—এমন কোন ভাষার সাহিত্য নেই যার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ইংরেজীতে অনূদিত হয় নি। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে যার ভাল ভাবে পরিচয় আছেতার কাছে বিশ্ব-সাহিত্যের দরজা খোলা। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশই সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিলাভের সুযোগ পেয়েছিল এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে আমরা পেয়েছিলাম শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর ভাব বিপ্লব। এদিক থেকে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় এবং তার কাছে আমরা যতটা ঋণী, সে পরিমাণে আমরা কিন্তু ইংরেজজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদকে নিজেদের ভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করিনি। রবীন্দ্রনাথ থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের ভাবধারার সঙ্গে তাল ফেলে চলার চেষ্টাকরে আসছি এবং প্রয়োজন বোধে ইংরেজী গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধের অনেক কিছু আমরা বেমালুম আত্মসাৎ করেছি তাদের গায়ে ভূয়া মৌলিকত্বের আবরণ চড়িয়ে। কিন্তু সুষ্ঠু ধারাবাহিকভাবে অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আমরা ইংরেজী-না-জানা বাঙালী পাঠকপাঠিকাদের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করিনি। ফলে বাংলার অনুবাদ সাহিত্য হয়ে পড়েছে দুর্বল। এমন যে কবি-নাট্যকার সেক্স্পীয়ার, যাঁর প্রভাব আমাদের রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের উপর বড় একটা কম নয় তাঁরও নাটকাবলীর পূর্ণাঙ্গ ও ভাল অনুবাদ বাংলা ভাষায় নেই। অথচ সেক্স্পীয়ার চর্চা আমাদের দেশে কম করে হলেও একশ বছর ধরে চলে আসছে। একে পরিতাপের বিষয় ছাড়া আর কি বলব? ইংরেজী গল্প, উপন্যাসও কবিতার ক্ষেত্রে যাঁরা মহারথী এবং যাঁদের রচনা নানাভাবে আমাদের সাহিত্যেকর্মকে প্রতিদিন প্রভাবিত করে চলেছে তাঁদের ক্ষেত্রেও এই একই বক্তব্য।

বাংলায় এ পর্যন্ত যে অনুবাদ সাহিত্য রচিত হয়েছে তার পিছনে যে কোন ধারাবাহিক সুচিন্তিত প্রয়াস নেই সে কথা পূর্বেই বলেছি।

আমার এ বক্তব্য আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অনুবাদ সাহিত্যে আমাদের যেটুকুও বা অগ্রগতি হয়েছে তারও মধ্যে ফাঁক ও ফাঁকি আছে প্রচুর। মূলত অনুবাদকারীদের ঝোঁক দেখা যায় গল্প উপন্যাসের দিকে। কবিতা বা প্রবন্ধাদির অনুবাদ সংখ্যায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। গল্প-উপন্যাসের অনুবাদের তুলনায় কবিতার ভাষান্তর অবশ্য বেশি কষ্টসাধ্য বলেই যদি আমরা তাকে সযত্নে এড়িয়ে চলি তাহলে আমাদের সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ দিক অনুর্বরই থেকে যাবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে এক সময় বিদেশী কবিতার বাংলায় অনুবাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাঁর রচনাবলী থেকে সে প্রমাণ আমরা পাই। তবে তাঁর মৌলিক কবি-প্রতিভা এত বড় ছিল যে কবি-জীবনে নিত্য নতুন কাব্য-সৃষ্টির তোড়ে তিনি এদিকে খুব একটা মনোনিবেশের সুযোগ পান নি। রবীন্দ্রনাথের পরেও নামী কবিদের মধ্যে, কাউকে কাউকে আমরা বিদেশী কবিতার তর্জমা করতে দেখেছি। কিন্তু তাঁদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পরে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের নাম করতে পারি। কাব্যে অনুবাদের প্রসঙ্গে কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর নামও উল্লেখযোগ্য। ইদানীং কালে জার্মান, ফরাসী এবং ইংরেজী কবিতার কিছু ভালো অনুবাদ পেয়েছি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অনুবাদ সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক—তার মধ্যে ধারাবাহিকতার বিকাশ যেমন নেই, তেমনই নেই কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা। তরুণতর কবি যাঁরা তাঁদের মধ্যে আমরা অনুবাদের দিকে কোন প্রবণতাই লক্ষ্য করছি না সম্প্রতি। বলা বাহুল্য এটা আমাদের সাহিত্যের পক্ষে খুব সুস্থতার লক্ষণ নয়। বিদেশী সাহিত্যের ভাব চুরি করে মৌলিক হবার প্রয়াস না করে আমরা যদি বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলিকে ভাষান্তরিত করি তাতে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে আরও বেশি।

বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলিকে ভাষান্তরিত করতে গেলে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি পরীক্ষাও হয়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে বাংলা ভাষা রসসাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত হলেও এ ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উচ্চস্তরের রচনা সম্ভব নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ অভিমত সমর্থন করি না। অথচ এ পর্যন্ত গল্প-উপন্যাস-কবিতার ক্ষেত্র ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে আমাদের যে কৃতিত্ব দেখা গেছে তার আলোকে বিচার করলে এ অভিমতকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এ অভিমতকে অপ্রমাণ করতে হ'লে আমাদের সমালোচনা সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ সাহিত্যের আরও উন্নতি হওয়া উচিত। বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত বহুমুখী শক্তি যে অপরিসীম সে কথা স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথ তাঁর বিচিত্র রচনাবলীর দ্বারা নানাভাবে প্রমাণ করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁকে আমরা সকল দিক থেকে সমানভাবে অনুসরণ করতে পারি নি। গল্প, কবিতা, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যে মান নির্দ্ধারণ করে গেছেন সর্বপ্রযত্নে সেই মানের মর্যাদা রক্ষার প্রয়াস পেলেও তাঁর উত্তরসূরীরা অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর বহুমুখী দানের পরিপূরণ সৃষ্টি করতে পারছেন না। এ বিষয়ে আমাদের মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভার অভাব যদি থাকে তবে তা নিজেদের কাছে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। এ অভাব বহুলাংশে সুষ্ঠ অনুবাদের দ্বারা পূরণ করে নেওয়া চলে। এই জাতীয় অনুবাদ যদি বাংলা ভাষায় ভালভাবে করা যায় তা হলে এ সত্যও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে যে বাংলা ভাষার শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কোন কারণ নেই।

এ কথা আমি আগেই বলেছি যে ইদানীং বাংলা ভাষায় অনুবাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। সেটা আশার কথা হলেও সে অনুবাদ বহুমুখী নয় বলে আশঙ্কার কারণও আছে। তা ছাড়া এই জাতীয় অধিকাংশ অনুবাদের পিছনে হয় থাকে পেশাদারী প্রেরণা, নয়তো

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার প্রয়াস। সৎসাহিত্যের অনুবাদ করে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে অনুবাদ করা হয় খুবই কম। ফলে অনুবাদও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্থক হয় না। ইদানীং বাংলা ভাষায় অনুবাদের সংখ্যা অনেক হলেও সার্থক অনুবাদের সংখ্যা খুবই কম। অনুবাদ সার্থক করে তোলার জন্যেও প্রকৃত সৌন্দর্যস্রষ্টার প্রয়োজন হয়। নিছক আক্ষরিক অনুবাদে ভাষান্তর হয়তো হয়, ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় না। অনুবাদকে সার্থক হতে হলে তাকে যেমন মূলের অনুগামী হতে হবে, তেমনই তাকে অনূদিত ভাষার সৌন্দর্যে শ্রীমণ্ডিত করে তুলতেও হবে। এই নিরিখে বিচার করলে আমাদের সাহিত্যের বহু অনুবাদই অসার্থক প্রতিপন্ন হবে। নিছক পেশাদারি এবং প্রচারকারী অনুবাদকদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অনুবাদ কার্য যতদিন সার্থক স্রষ্টাদের হাতে না পড়ে ততদিন এ দুর্ভোগ যাবে না।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের দুর্বলতা আর এক দিক থেকেও প্রকট। বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্য ছাড়াও আরও কয়েকটি ভাষায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, উর্দু প্রভৃতি সাহিত্যের নাম করতে পারি। বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমরা অনুবাদের মাধ্যমে পাবার চেষ্টা তো করিই নি, নিজেদের দেশের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সঙ্গেও আমরা পরিচিত নই। এটা রীতিমতো দুর্ভাগ্যের কথা। আমরা অর্থাৎ ভারত-বাসীরা মুখে 'একজাতি, একপ্রাণ, একতা'র কথা বলি, কার্যত দাবী তুলি ভাষাভিত্তিক রাজ্যের এবং শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের সমসাময়িক কালের সৃষ্টির সঙ্গেও পরিচয় রাখি না। এই একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী কোন সাহিত্যের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ নয়। ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে এই বাধা অপসারিত হওয়া প্রয়োজন। আমার বাংলা সাহিত্য ভারতবর্ষের মধ্যে সব সাহিত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই আত্মসন্তুষ্ট মনোভাব নিয়ে বসে থাকলেই নিজেদের সাহিত্যের দৈন্য কোনদিন দূর হবে না এবং অন্যান্য

সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করতে না পারলে আমাদের এ দাবীর জোর কতখানি তাও বোঝা যাবে না। ভারতের অন্যান্য ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিগুলি যদি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়, তাতে একদিকে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য যেমন বেড়ে যাবে অন্য দিকে তেমনই অন্যান্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির নিরিখে নিজেদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি বিচার করে দেখবার সুবোগ পাবেন সাধারণ পাঠকপাঠিকারা। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যানুবাদের এদিকটিতেও আমাদের সুধী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

আর একটি মাত্র বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি করি। আমাদের সাহিত্যকে অনুবাদের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে যাঁরা অনুবাদ করবেন তাঁদের বহুভাষাবিদ হওয়া উচিত। অনুবাদ নামে বাংলা ভাষায় আমরা প্রায়ই যা পাই তা অনুবাদের অনুবাদ। এতে মূলের রস প্রায়ই থাকে না। মনে করুন এমিলি জোলার একখানি ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হল বাংলা ভাষায়। খোঁজ নিলে দেখা যায় যে অনুবাদক সেটি মূল ফরাসী ভাষা থেকে রূপান্তরিত করেন নি, ভাষান্তর ঘটেছে ইংরেজী অনুবাদ থেকে ফরাসী থেকে যিনি ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করেছেন তাঁর হাতে মূল রস একবার ব্যাহত হয়েছে। আবার এই ইংরেজি অনুবাদের যখন বাংলা অনুবাদ বেরোয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই মূলের রস বহুলাংশে ব্যাহত হয়। ইদানীং বাংলার সুধী সমাজে বহুভাষা চর্চার অভাবই এজন্যে দায়ী। আমরা যদি সত্যই আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করতে চাই, তা হলে নানা ভাষা চর্চার দিকে মন দিতে হবে। যে মূল ভাষায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা প্রবন্ধ রচিত, সেই ভাষা থেকেই তা আমাদের অনুবাদ করতে হবে। তা নইলে আমাদের অনুবাদ সাহিত্য পুষ্ট হবে না।

—০—

